নরসুন্দর সমিতি

মুলক্‌রাজ আনন্দ্‌

নরসুন্দর সমিতি

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব : কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

প্রথম বাংলা সংস্করণ—১৯৫২

দাম : এক টাকা বার আনা

প্রকাশক : বিমল মিত্র, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ১২
মুদ্রাকর : ননীগোপাল পোদ্দার, ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা ৬

বাবু বুলাকিরাম

'কর্ণেল সাহেব কি আপিসে এসেছেন?'

সাইকেলের ব্রেক চেপে বেমানান ভঙ্গিতে নামতে নামতে ত্রস্ত শংকিত স্বরে প্রশ্ন করলেন বাবু বুলাকিরাম।

'না বাবুজী, এখনো আসেননি।' জবাব দিল পাকা দাড়িওলা শিখ সেপাই-আর্দালি বচিতর্ সিং।

এই আশ্বাসজনক জবাব পেয়েও বাবু বুলাকিরাম তাড়াহুড়ো করতে লাগলেন। সাইকেলটা ঠেস্ দিয়ে রাখলেন বাংলোতে ঢুকবার ধুলোভরা মোটররাস্তার ধারে ধারে অল্প কিছুদিন হল যে ছোট ছোট গাছগুলো লাগানো হয়েছে তারই একটির ঘের-দেওয়া রেলিংএর গায়ে। বাংলোটার অধিকাংশ জুড়ে কর্ণেল পটিংগারের (রিক্রুটিং অফিসার) আবাস, একটা অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে লাহোর ডিভিসনের বিভিন্ন ব্রিগেডে লোক ভর্তি করার আপিসের জন্য। ওদিকে লোহার রেলিং-এ ঠেস দেওয়া অবস্থায় সাইকেলের স্টিলের কাঠামো কিছুতেই স্থির থাকছে না। সকাল থেকেই মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম যেন একেবারে ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। শুধু মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম কেন, অন্য যে সমস্ত নিয়ম

স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখে সেগুলোও। আজ সকালে উঠেই তিনি বেড়ালের মুখ দেখেছেন বোধ হয়। তাই সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বৌয়ের প্যান্‌প্যানানি, আলোহীন স্নান-কুঠরিতে দাড়ি কামাতে গিয়ে চিবুক কেটে ফেলেছেন, সময়মত রান্না হয়নি, বাড়ি থেকে বেরোতে গিয়েই গলির মোড়ে স্তূপাকৃত গোবর ও জঞ্জালের উপর পা ছিট্‌কে পড়বার মত অবস্থা হয়েছিল, সোনালী গির্জা পার হয়ে বাজারের সরু রাস্তায় ছুটো টঙ্গাকে রাস্তা পার হতে দিতে গিয়ে সাইকেলের গতি ধীর করবার সময় প্রায় পড়ে যাচ্ছিলেন। গত কয়েকদিন তাঁকে কেন্দ্র করে প্রায়ই এ ধরনের ঘটনা ঘটছে···

রেলিং-এ ঠেস দিয়ে সাইকেল রাখছেন, যন্ত্রটা ঠিক যেন জীবন্ত বস্তুর মত হাত থেকে ফস্‌কে বেরিয়ে দড়াম্ করে পড়ল তাঁর পায়ের উপর।

'বাবুজী, আজ সকালে আপনার বাহনটি দেখছি বড় একগুঁয়ে হয়ে উঠেছে।' কথাটা বলে আর্দালি ছুটতে ছুটতে এল তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে।

বাবু বুলাকি রাম ছড়ে-যাওয়া হাঁটুর উপর ঝুঁকে পড়ে হাত বুলোলেন, তারপর মাথা তুলে আর্দালির দিকে তাকিয়ে হাসলেন বিব্রত ভঙ্গিতে। বিপর্যয়টা কাটিয়ে উঠেছেন, এমন সময় নজরে পড়ল খাকি হাফ্‌প্যান্টের উপর তেলকালির একটা লম্বা দাগ বিশ্রীভাবে ফুটে উঠেছে। দাগটা দেখে চোখ খোঁচ করে ভাবতে লাগলেন যে কর্ণেলের চোখ যদি পড়ে তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোষাকে আপিসে না আসবার জন্য ধমক দেবেন। সূর্যের চোখ-ঝল্‌সানো আলো আটকাবার জন্যে তিনি গগ্‌লস্ পরেছিলেন, সেটা চোখ থেকে খুলে নিয়ে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেন দাগটা সত্যিই খুব বড় কিনা আর কাচলে

উঠবে কিনা। তারপরে, যেন কিছুই হয়নি এমনি মুখের ভাব করে হাত তুলে ঘর্মাক্ত মুখ মুছতে লাগলেন।

বারান্দা পার হয়ে নিজের আপিসের দিকে যাচ্ছেন, দেখলেন সহকারী কেরানী উধম সিং পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে। বেঁটেখাটো লোকটি, পেটে কথা থাকে না, মুখে ছাগল-দাড়ি, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে।

বাবু বুলাকি রামের চামড়া-কুঁচকানো মুখটা অত্যধিক গাম্ভীর্যে থম্‌থমে হয়ে উঠল, বললেন: 'বাপু হে, রোগ সারাতে যদি না পার তো অন্তত রোগ বাড়িয়ে তুলো না। ক'টা বেজেছে? কর্ণেল সাহেব এসেছেন নাকি? আমার হতচ্ছাড়া ঘড়িটা আবার বন্ধ হয়ে গেছে, সারাতে দিয়েছি।' অধস্তন কর্মচারীর অন্তরঙ্গ চালচলনে তিনি এবার চটে উঠেছেন এবং বক্তব্য সংক্ষেপ করলেন। অবশ্য অন্য সময়ে তিনিই এ ব্যাপারে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

'মাত্র সাড়ে-আটটা, কর্ণেল সাহেব এখন বোধ হয় তাঁর সেই শাঁকচুন্নি মেমটার কাছে হাজ্‌রি দিচ্ছেন।' সাদা সুতির সার্টের কড়া ইস্ত্রি-করা আস্তিনের তলায় শস্তা দামের রিস্ট্‌-ওয়াচের দিকে তাকিয়ে উধম সিং বলল; লোমশ গা থেকে দর্‌ দর্‌ করে ঘাম ঝরছে, সার্টের আস্তিনে সেই ঘামের কালো কালো ছোপ। তারপর সে সোজাসুজি একটা চাষাড়ে রসিকতা করে বসল:

'বাবু বুলাকিরাম, আপনি যদি এমন হাড়কিপ্পণ না হতেন তাহলে আর আপনাকে এই দুর্ভোগ ভুগতে হত না। শস্তা জাপানী ঘড়ি আর শস্তা জাপানী সাইকেল কিনলে এই দশাই হয়।'

সহকর্মীর এই রসিকতায় কান না দিয়ে বুলাকিরাম বললেন:

'ঠিক সময়ে না এলে কর্ণেল সাহেব কুকুরের মত খেঁকিয়ে ওঠেন। আমি ভেবেছিলাম আমার দেরি হয়ে গেছে। সূর্য আকাশের অনেক উপরে উঠে গেছে মনে হচ্ছিল।'

'তা নয়। আর বাবু বুলাকিরাম, আপনি কেন এইসব চুনোপুটি সাহেবের তোয়াক্কা করবেন।' গেঁয়ো লোকের মত অবাধ ও উচ্ছল খামখেয়ালিপনার সুরে আশ্বাস দেবার মত ভঙ্গিতে উধম সিং বলল: 'আপনি হচ্ছেন আপিসের বড়বাবু, আপনি—'

'আমি হেডকোয়ার্টারের যে চিঠিগুলোর খসড়া করতে তোমাকে বলেছিলাম, সেগুলো হয়েছে?' ভারিক্কী গলায় বুলাকিরাম প্রশ্ন করলেন: 'নাকি ভাঁড়ামি করেই সময় কাটিয়েছ?'

উধম সিং তাড়াতাড়ি জবাব দিল: 'ও হ্যাঁ, আমি ওগুলো করিয়ে নেব।' তারপর হাত জোড় করে বিনীত ভঙ্গির ভান করে বলে চলল. 'আপনি তো জানেন, আমি এই আংরেজি ভাষায় লিখতে পারি না। আপনি আমার একটা উপকার করবেন? যদি করেন তো লোবাং-এর দোকানে আপনাকে বড় এক পেগ্ খাইয়ে দেব। চিঠিগুলোর খসড়া যদি আমি করি তাহলে আপনি সেগুলোর ভুল শুধরে দেবেন? আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।'

'তোমার লেখাই হল না তো ভুল শুধরে দেওয়া। শেষ পর্যন্ত আমাকেই না চিঠিগুলো লিখতে হয়। তাই হবে দেখছি।'

উধম সিং দু-হাতে বড়বাবুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল: 'আপনার মত বন্ধু আর হয় না! আপনাকে আর কি বলব, আপনার মত জ্ঞানী লোকই বা কে আছে! ভারতীয় বাহিনীতে আপনি হচ্ছেন সেরা লোক!'

'থাক্, থাক্, ওসব কথা থাক্', বাধা দিয়ে বুলাকি বললেন, 'তোমার

মুখের রশুনের গন্ধে আর গায়ের ঘামের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে।' তারপর উধম সিং-এর বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে আপিসে ঢুকলেন। সাদা চুণকাম করা প্রকাণ্ড ঘর, টেবিলের উপর ছড়িয়ে আছে ফাইলের স্তূপ, কালির বোতল, ক্লিপ ও লাল ফিতে। ঘরের মাঝখানে একটা তাকের একপাশে যুদ্ধকালীন জরীপ-মানচিত্র, অন্য পাশে চোখের দৃষ্টি পরীক্ষা করবার জন্যে সারি সারি ফুটকি দেওয়া চার্ট।

ঘরের সিলিং থেকে বিজলি-পাখা ঝুলছে। সুইচ্‌টা টিপে দিয়ে তিনি চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। এতক্ষণে দম নেবার সময় হল। মাথা থেকে পাগ্‌ড়িটা খুলে রাখলেন একটা রেকাবির উপর, তারপর চুলের নীচে মাথা ও ঘাড়ের ঘাম মুছতে লাগলেন। এই কাজটা এত তৎপরতার সঙ্গে করতে লাগলেন যে, মাথার উপরকার ধর্মের সাক্ষী গেরো দেওয়া চুলের গোছা এপাশ ওপাশ দুলতে লাগল।

'কী জীবন!' সকালের ডাক খুলবার আগে পাখার হাওয়ায় শরীরটাকে একটু জুড়িয়ে নিতে নিতে অস্থির গলায় বিড়বিড় করে বললেন। যাক্‌, তবুও এবার একটু শান্তি। আপিসে আসবার জন্যে এত তাড়াহুড়ো, যাক্‌, কর্ণেল সাহেব এখনো আপিসে আসেননি···উঃ আসবার আগে গোগ্রাসে খেয়ে আসতে হয়েছে। আর তারপর এই অকর্মার ধাড়ী উধম সিং। ও ভাবে কি, ওর হয়ে সব কাজ তিনিই করে দেবেন নাকি! এই কাজের কোন রকম যোগ্যতা নেই ওর। কিন্তু তবুও তিনি, স্বয়ং বুলাকিরাম, ওকে সাহায্য না করে পারেন না। কারণ, উধম সিং-এর কাকাই ছিলেন এই আপিসের বড়বাবু, তিনি বুলাকির পদোন্নতির জন্যে সুপারিশ করেছিলেন এই শর্তে যে, উধম সিং-এর অযোগ্যতাকে তিনি খাপ খাইয়ে নেবেন। এজন্যে যা কিছু

বৌয়ের চাপে পড়ে তিনি তাঁর শ্বাশুড়ীকে আরও পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছেন তবে এই চিঠিটায় তাকে উদ্দেশ ক'রে অনেক 'ভৎ'সনা ও অভিযোগ থাকবে। কিন্তু মোড়ক কেটে চিঠি খুলবার আগেই উধম সিং ঢুকল এবং একেবারে গলে-পড়া গোছের একটা বিনীত ভঙ্গি মুখের উপরে ফুটিয়ে তুলে বলল :

'বাবু বুলাকিরাম, বাবু বুলাকিরাম, আপনাকে একটু বিরক্ত করব, কিছু মনে করবেন না তো ?'

'হায় ভগবান !' অধৈর্যের সঙ্গে মুখটাকে ভারিক্কী ক'রে তুলে তিনি ঝাঁজিয়ে উঠলেন : 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না বাপু ! আবার তোমার কি চাই ? জ্বালিয়ে মারবে দেখছি !'

ভিক্ষে চাইবার মতো হাতদুটো জোড় করে উধম সিং বলল :

'বাবু বুলাকিরাম, আপনাকে বিরক্ত করছি বলে মাপ করবেন। কিন্তু আপনিই সেদিন বলেছিলেন, পণ্ডিতের মত লিখবে আর সাধারণ লোকের মত কথা বলবে—'

বাধা দিয়ে কিছুটা ক্রুদ্ধ ও কিছুটা বিদ্রূপের স্বরে বুলাকি রাম বললেন :

'কিন্তু তুমি ঠিক উল্‌টোটা করো। তোমার কথাবার্তা পণ্ডিতের মত আর লেখা সাধারণ লোকের মত···তোমার হাত থেকে কবে রেহাই পাব বলতে পার ? জোঁকের মত তুমি আমার গায়ে এঁটে থেকে আমার জীবনকে শুষে নিচ্ছ !'

'তাহলে শুনুন, পণ্ডিতের মত যদি লিখতে হয়', বড়বাবুর অসন্তোষকে এড়াবার জন্যে বোকার মত ভান করে উধম সিং বলে চলল, 'আচ্ছা বাবু সাহেব, ধরুন না কেন, আপনার মতই যদি লিখতে হয়, তাহলে

প্রথমেই দরকার সরকার-বাহাদুরের মোহর-আঁকা বড় সাইজের ফুলস্কেপ কাগজ···আপনি আমার উপর এটুকু দয়া করুন, আমি আপনার অধীন চাকর, আপনার সহকর্মী, আপনার ছোট ভাই, দয়া করে আমাকে কিছু পরিষ্কার কাগজ আর—'

বুলাকি বললেন : 'কাল তোমাকে যে কাগজগুলো দিয়েছি সেগুলো নষ্ট করেছ তো? উধম সিং, তোমাকে যথার্থ বলছি যে এ-ধরনের ব্যাপার আমি চলতে দিতে পারি না। সরকারের সম্পত্তি এভাবে নষ্ট করবার কোন অধিকার তোমার নেই। এজন্যে কর্ণেল সাহেবের কাছে আমাকেই কৈফিয়ৎ দিতে হয়, তোমাকে নয়···'

একটুও না দমে এবং কিছুমাত্র লজ্জা না পেয়ে উধম সিং বলল :

'বুলাকিরাম বাবু, এবারটির মত, শুধু এই একবার, আমাকে ক্ষমা করুন! এ-ধরনের অপরাধ আমি আর কক্ষনো করব না। ছোট ভাইয়ের উপর রাগ করতে নেই, জানেন তো। এরপর আজ আমি আর একবার আপনাকে বিরক্ত করব—আমার লেখার ভুল শুধরে নেবার জন্যে আমি আবার আসব।' এই বলে একেবারে 'বিনয়ের অবতার' সেজে সে দাঁড়িয়ে রইল।

বুলাকিরাম ফেটে পড়লেন : 'তুমি একেবারে সহ্যের শেষ সীমায় গেছ। যে লেখার ভুল শুধরে দিতে হবে তা লেখার জন্যে তোমাকে ভাল সরকারী কাগজ নষ্ট করতে দিতে পারি না। বাজে কাগজে লেখ গিয়ে।'

'তাহলে দয়া করে আমাকে কিছু বাজে কাগজ দিন।'

'হায় ভগবান!' বুলাকি ফুঁশে উঠলেন : 'বাজে কাগজও কি খুঁজে নিতে পার না? আচ্ছা, এই টেলিগ্রাম পাঠাবার প্যাড্‌টা নিয়ে যাও, এই কাগজে লেখ···'

'আর ভুল শুধরে নতুন করে লেখার জন্যে কিছু ফুলস্কেপ কাগজও দয়া করে দিন, আপনার পায়ে পড়ছি,' উধম সিং জবাব দিল।

'আচ্ছা নিয়ে যাও, আর আমাকে জ্বালিও না।' বলে তিনি হাফ্‌প্যান্টের পিছনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে চাবির গোছা হাতড়াতে লাগলেন।

ছোট ছেলের মত আবদারের ভঙ্গিতে উধম সিং আবার বলল, 'দয়া করে একটা নতুন কোহিনূর পেন্সিল আর একটু কালিও দেবেন।'

'তুমি কিছু পাবে না।' কৌতুক মেশানো স্বরে বুলাকিরাম বললেন। সহকারীর দাবির বহর শুনে তিনি মনকে শক্ত করে নেন।

'অমন করছেন কেন, দিন না!' বলে এগিয়ে এসে উধম সিং বুলাকির কাঁধে, হাতের পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে নাছোড়বান্দার মত পীড়াপীড়ি করতে থাকে।

'হয়েছে, হয়েছে, থাক্। সরে দাঁড়াও দেখি। পাগল হলে নাকি?' হাসতে হাসতে বুলাকি বললেন। তারপর, উল্টো দিকের যে দেওয়াল আলমারির মধ্যে কাগজ-পেন্সিল ইত্যাদি জিনিসগুলো তালাবন্ধ থাকে তার চাবিটা বার করবার জন্যে তিনি ড্রয়ার খুলতে লাগলেন।

ঠিক এমনি সময়ে আর্দালি বচিতর সিং ঘরে ঢুকে ঘোষণা করল:

'বাবুজী, ঠিকাদার শেখ মহম্মদ দিন্ এসেছেন। বাংলোর কোথায় কোথায় মেরামতী কাজ হবে সেই সম্পর্কে তিনি কর্ণেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'দূর ছাই!' এক সঙ্গে এতগুলো কাজ করতে হবে দেখে বুলাকিরাম দিশাহারা হয়ে বলে উঠলেন, 'দাঁড়াও, আগে এই গর্দভটাকে বিদেয় করি,

তারপর আমি শেখ মহম্মদ দিনের সঙ্গে দেখা করব। ভগবান! এখনো ডাকের চিঠিগুলি খোলা হল না।'

'শেখ সাহেব তাঁর টঙ্গাতে অপেক্ষা করছেন,' নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে এবং একটু যেন বোকার মত বচিতর সিং বলল: 'তাঁকে কি বলব, বাবুজী?'

'কি বলবে,' বলে বুলাকি এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর সামনের ফৌজী ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন: 'আগে দেখ গিয়ে কর্ণেল সাহেব আপিসে এসেছেন কিনা। যদি এসে থাকেন তাহলে শেখ সাহেবকে বলো তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনি তো আগেও সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছেন।'

এইবার তিনি উধম সিংকে বিদেয় করবার কাজে মন দিলেন।

বচিতর সিং পা টিপে টিপে কর্ণেলের আপিসের দরজার দিকে এগোল, তারপর ভিতরে উঁকি দিয়ে ফিরে এসে ফিস্‌ফিস করে বলল:

'হ্যাঁ বাবুজী, সাহেব টেবিলের সামনে বসে আছেন।'

'বসে আছেন?' মৃদুস্বরে বুলাকি বললেন: 'ডাকের চিঠির জন্যে আমাকে এখনো ডাকলেন না তো!...কিন্তু...আচ্ছা, শেখ মহম্মদ দিনকে ভিতরে যেতে বলো।' তারপর তিনি অভ্যাসবশত নীচু হয়ে পায়ের জুতো খুলে পাটকিলে রং-এর মেঝের উপর রাখলেন। জুতোর শব্দ শুনে সাহেবের কাজের ব্যাঘাত হতে পারে, এই ভয় থেকে তার এই অভ্যেসটা হয়েছে।

'এখন আমার মনে পড়ছে, আমার কিছু কার্বন-কাগজও চাই।' উধম সিং বলল। বুলাকি তখন উঠে এসে দেওয়াল-আলমারীটা খুলে তাকগুলো হাতড়াচ্ছিলেন।

তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না—আমি মরলে তোমার চাওয়া মিটবে!' বিড়বিড় করে বুলাকি বললেন।

'সালাম বাবুসাহেব।' আপিস-কামরায় ঢুকতে ঢুকতে শেখ মহম্মদ দিন বললেন। একজন পাঞ্জাবীর সঙ্গে অপর একজন পাঞ্জাবীর সাক্ষাৎ হলে যে কায়দায় সে অভিবাদন করে সেইভাবেই তিনি কথাগুলো বললেন। পরনে ধবধবে সাদা পোষাক, মুখের ঘন দাড়ি হেনারঙে রাঙানো।

'শস্-স্', বুলাকি তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং ঠোঁটের উপর ডান হাতের তর্জনী চেপে কর্ণেলের আপিসের দিকে আঙুল দেখিয়ে ফিসফিস করে বললেন :

'বাংলোর সাজসজ্জা নতুন করে করতে হবে, এই জন্যেই তো? কর্ণেল সাহেব দপ্তরে আছেন। সুতরাং আপনি ভিতরে যেতে পারেন।'

'আচ্ছা হুজুর...' অন্য সময় হলে বুলাকিকে মস্থর-খেকো হিন্দু বলতে তাঁর বাধত না, কিন্তু এখন তিনি খাঁটি ব্যবসায়ীর মত বড়বাবুকে একটু তোয়াজ করবার জন্যে কথাগুলো বললেন।

'আপনার সঙ্গে পরে আমি দু-তিনটে বিষয়ে কথা বলব বাবুজী।'

বুলাকি বললেন : 'আপনার অশেষ দয়া। যাবার আগে আমার সঙ্গে একটু দেখা করে যাবেন।' তারপর মুখের উপর একটা কৃত্রিম বিনয়ের হাসি ফুটিয়ে তুলে ঠিকা কাজের উপর তার নিজের দালালী সম্পর্কে কথাবার্তা বলার তাৎপর্যটুকু প্রচ্ছন্ন করে রাখলেন।

কর্ণেলের আপিসের দরজা দিয়ে ঠিকাদার ভিতরে ঢুকে গেলেন আর বুলাকি উধম সিংকে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দেবার জন্যে ফিরে দাঁড়ালেন।

উধম সিং বলল : 'এই মোসলাগুলো একেবারে নেমকহারাম। আমি হলে হাতে হাঁতে পয়সা না দেবার আগে কাজ শুরু করতেই দিতাম না। যদি আগে থেকে জানতাম যে কর্ণেল সাহেব তাঁর বাংলোর সাজসজ্জা নতুন করে করাবেন তাহলে ভাল হত। তাহলে আমি সর্দার বুটা সিং নামে একজন শিখ ভাইকে ঠিকা নেবার জন্যে আসতে বলতাম। আমরা যা দালালী চাইতাম তাই সে দিত।'

বুলাকি বললেন : 'এই হারামজাদাগুলোই সমস্ত হাতিয়ে নিচ্ছে। ওরা জোট বেঁধে থাকে আর একে অপরকে সাহায্য করে। আর তাছাড়া সরকারেরও নেকনজর ওদের দিকে কারণ সরকারের নীতিই হচ্ছে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন কায়েম রাখা।'

'তাই আপনার উচিত ছিল ওই গরু-খেকোটার কাছ থেকে প্রথমে নিজের পাওনা আদায় করে নেওয়া এবং তারপর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া।'

'ওতে কিছু যায় আসে না। টাকার ওপর আমার লোভ নেই। সাহেবকে এক ঝুড়ি ফল ভেট দিয়ে আমার চাকরিটা ওর নিজের ছেলের জন্যে বা অন্য কারও জন্যে বাগিয়ে না নেয়—এইটুকু হলেই আমি যথেষ্ট মনে করব।'

উধম সিং বলে 'বাবু বুলাকিরাম, আপনি একি বলছেন, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে না।·'

'তোমার কি নিব দরকার?' বুলাকি জিজ্ঞেস করলেন। উধম সিং-এর কথা শুনে তার আত্মম্ভরিতা পরিতৃপ্ত হয়েছে এবং তিনি আরও বেশি উদার হয়ে উঠতে চাইছেন।

খোশমেজাজে উধম সিং বলে উঠল. 'ঝড় উঠুক না, আমরা ডাল

জুড়োব। বাবু বুলাকি রাম, কয়েকটা নিবও আমাকে দিন। আমার ছোট ভাই গাঁয়ের স্কুলে পড়ে, তাকে আমি দেব আর তারপর—'

'শ্-স্-স্...' কথার মাঝখানে উধম সিংকে থামিয়ে দিয়ে বুলাকি কান খাড়া করে শুনতে লাগলেন ;

কিছু একটা পড়ে যাওয়ার শব্দ...

বুলাকির মুখচোখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, উদগ্র হয়ে তিনি শোনবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অসুস্থ লোকের যন্ত্রনার গোঙানির মতো একটা শব্দ হচ্ছে, তারপরেই হঠাৎ হুটোপাটি হওয়ার মত হুড়দাড় আওয়াজ এবং একটি আতঙ্কিত মুহূর্তে ঠিকাদারের বিরাট বপুটি ছিটকে এসে বুলাকির আপিস-ঘরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ভয়ে তটস্থ হয়ে বুলাকি দাঁড়িয়ে রইলেন, নড়বার চড়বার ক্ষমতা রইল না। পা দুটো আপনা থেকেই কাঁপছে, চোখেমুখে বীভৎস ভয়ের ছাপ।

উধম সিং ঠিকাদারের দিকে ছুটে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে বুলাকির মনে হতে লাগল যেন তিনি দেখছেন কর্ণেলের রাগে লাল টকটকে মুখটা দরজার বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং তার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

কর্ণেলকে তিনি চিৎকার করে বলতে শুনলেন: 'এই লোকটাকে ঘরে কে পাঠিয়েছে,' তারপরেই রাগে ফুঁশতে ফুঁশতে মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। বুলাকির চারপাশে সব কিছু যেন শূন্যে ঘুরছে, মনে হল যেন সাহেবের স্থির দৃষ্টির সামনে তিনি অচেতনতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছেন। মুহূর্তের অসংলগ্ন চিন্তায় তার মনের সেই ভয়ের ছায়াটুকু ভয়ংকর একটা আতঙ্কের মত বিস্তৃতি লাভ করল—লালচে আর বেগুনে একটা অস্পষ্টতার

মত, কোন আকৃতি নেই কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব ও অবয়ববিশিষ্ট। পায়ের তলায় শক্ত ইঁটের ছোঁয়া লাগছিল এবং তিনি নিজেকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি তবুও নড়তে পারলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল যেন দরজার কাছে কর্ণেলের উপস্থিতিটুকু বাতাসে শরীরী হয়ে রয়েছে।

'বাবু বুলাকিরাম, এদিকে এসে শেখসাহেবকে তুলে ধরতে সাহায্য করুন।' স্বাভাবিক গলায় উধম সিং বলল।

বুলাকির নির্মম ভাগ্য যেন তাঁর কপালের ঘনকুঞ্চিত চামড়ার রেখায় রেখায় ঝরে পড়ছে। জামার আস্তিন দিয়ে তিনি মুখের ঘাম মুছলেন এবং হতচকিত হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল, আর চারপাশের গুমোট বাতাসে জ্বরো রুগীর মত ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন।

ঘটনাটা কি ঘটেছে জিজ্ঞেস করবার জন্যে তিনি মুখ খুললেন, কিন্তু তাঁর গলা শুকিয়ে গেছে, এবং তিনি একটি কথাও উচ্চারণ করতে পারলেন না। তার পা-দুটো এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন এক পা নড়লেই শরীরের ভার আর সহ্য হবে না…

দেওয়াল আলমারির গায়ে ঠেস্ দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্ণেলের মুখে যে দৃষ্টি তিনি দেখেছেন বলে তাঁর মনে হচ্ছিল তা ভেবে তাঁর ইচ্ছার মূল শক্তিকেন্দ্রটি যেন হার মেনেছে ও ভেঙে পড়েছে, মুখের ভেঙে-পড়া ভাবটি দূর করে চেষ্টা করলেন আগেকার সমাহিত গাম্ভীর্য-টুকু আবার ফিরিয়ে আনতে। মনে মনে ভাবলেন যে সাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি অবিচলিতভাবে আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবেন এবং বিড়বিড় করে বললেন: 'আমি চাকরিতে ইস্তফা দেব।'

উধম সিং-এর সাহায্যে ঠিকাদার উঠে দাঁড়ালে, সেদিকে তিনি তাকিয়ে দেখলেন।

'কি হয়েছে, শেখসাহেব?' মহম্মদ দিন-এর পাগড়িটা খুলে গিয়েছিল সেটা ঠিক করে দিতে দিতে এবং তাঁর জামাকাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উধম সিং জিজ্ঞেস করল।

'ও কিছু না, সর্দারজী!' পাগড়ির খোলা দিকটা উধম সিং ধরে আছে, আর অন্যদিকটা ভাঁজে ভাঁজে জড়াতে জড়াতে ঠিকাদার জবাব দিলেন।

'তবুও কি হয়েছে শুনি না?' উধম সিং জিজ্ঞেস করল।

'কিছু না ভাই। কোন কথা হয়নি!' ঠিকাদার জবাব দিলেন।

'সালাম, সালাম বাবুজী…' বলে তিনি বচিতর সিং-এর পাশ দিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন, তারপর এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বিব্রতভাবে একটু হেসে বললেন. 'এ্যাবট্ রোডে আরেকজনের সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা আছে। আপনার কাছে একটা চিঠি পাঠাবার বন্দোবস্ত করব।' তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন।

'বাবু বুলাকিরাম, কি হয়েছে বলুন তো?' উধম সিং জিজ্ঞেস করল।

চেয়ারে বসে দু-হাতে মাথা রেখে বুলাকি বসে রইলেন।

একটু পরে তাঁর গলা দিয়ে স্বর বেরুল, চাপা গলায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন: 'ওহে বচিতর সিং, সাহেব কি সত্যিই আপিসে ছিলেন?'

'বাবুজী, আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারব না। তবে তিনি তো এই সময়ে দপ্তরেই থাকেন। আমার যেন মনে হল তিনি দপ্তরেই—'

উধম সিং বলল: 'তুমি একটি গর্দভ, তোমার শুধু মনে হল যেন

তিনি রয়েছেন। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে সাহেব আপিসে ছিলেন না এবং ঠিকাদার ভুলে সোজা গিয়ে ঢুকেছিলেন মেমসাহেবের ঘরে আর খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। সেজন্যেই তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে গিয়ে পড়ে গেছেন এখানে…'

'বাবুজী, আমার যেন মনে হল আমি কর্ণেল সাহেবকে টেবিলের সামনে বসা অবস্থায় দেখলাম।' নিজেকে সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত করে নেবার চেষ্টায় বারবার একই কথা জোর দিয়ে বলবার উত্তেজনায় বড় বড় চোখে বচিতর সিং বলল।

উধম সিং জিজ্ঞেস করল : 'বাবু বুলাকি রাম, আপনার কি মনে হয় সাহেবের সঙ্গে কথা না বলেই ঠিকাদার চলে গেছেন?'

বাবু বুলাকি রাম সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে সাহেবের দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাহেব কি সত্যিই আপিসে ছিলেন? ব্যাপারটা কি হল? এবার কি হবে? ড্রয়ারের ভিতর থেকে ইস্তফা-পত্রটি তিনি টেনে বার করলেন, তাঁর শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা প্রচণ্ড একটা মোচড় দিয়ে উঠল, শূন্য দৃষ্টিতে তিনি পত্রটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন : 'আমি হেডকোয়ার্টার থেকে যে-সব আদেশ এসেছে, সেই ফাইলটা আমাকে দিয়ে যাও তো হে।'

মহারাজা ও কচ্ছপ কাহিনী

[রোজার বারফোর্ড-কে]

প্রাচীন (এবং অবশ্যই অভিজাত) রাজপরিবারের মধ্যে যারা স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে যুগ যুগ ধরে বংশের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে সূর্যবংশী গোষ্ঠীর উধমপুরের মহারাজার বংশই হচ্ছে সব চেয়ে প্রাচীন ও সবচেয়ে অভিজাত। রাজা রামচন্দ্র এঁদের আদিপুরুষ, এই দিক থেকে এঁরা নিজেদের সূর্যের বংশধর বলে দাবি করেন।

এঁরা সকলেই উন্নতশির যুদ্ধপ্রিয় দলপতি, এঁদের অসমসাহসিক কার্যাবলী ভারতের ঘরে ঘরে মুখের কথায় পর্যবসিত, এঁদের হীরাজহরৎ, মণিমুক্তা, নীলকান্তমণি ও হাতী ইউরোপের মেয়ে দোকান-কর্মচারীদের ঈর্ষার বস্তু, ভারতে শৃঙ্খলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে এঁরা বৃটিশরাজকে লোক-অর্থ-উপকরণ দিয়ে যে অতুলনীয় সাহায্য করেছেন তা সরকারের দ্বারা নানাভাবে স্বীকৃত—লক্ষ লক্ষ গরীবের উপর খবরদারী করবার কাজে নিযুক্ত করে সরকার এঁদের সঙ্গে সন্ধি করেছেন, অজস্র উপাধি, প্রশংসাপত্র ও লিপি দান করেছেন এঁদের।

ভারত সরকারের এক বিশেষ ঘোষণার বলে 'সূর্যের বংশধর'

হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া ছাড়াও শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ স্যার গঙ্গা সিং বাঁহাদুর যখন তাঁর বরেণ্য পিতা মহারাজ গুলাব সিং-এর মৃত্যুর পর পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন দিল্লীর করোনেশন দরবারে মহামান্য সম্রাটের পার্শ্বচর হিসেবে তাঁর কার্যাবলীর জন্যে তাঁকে স্টার অব ইণ্ডিয়ার নাইট কমাণ্ডার (দ্বিতীয় শ্রেণী) করা হয়। এছাড়া যুদ্ধের সময়ে পুরো এক বাহিনী মাইন্ স্থাপক ও পরিষ্কারক সৈন্য সরবরাহ করবার জন্যে এবং রণক্ষেত্রে ও দেশের অভ্যন্তরে বীরত্বপূর্ণ কার্যাবলীর জন্যে তাকে একুশ তোপের সেলাম বরাদ্দ করে পুরস্কৃত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়-ভাণ্ডারে দরাজ হাতে অর্থসাহায্যের জন্যে হাথ্রাস্-এর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডক্টর অব ল' উপাধি দ্বারা তিনি সম্মানিত এবং আমেরিকার কয়েকটি মহিলা-ক্লাবের ও যুক্তরাজ্যের রেশম-জরি বিক্রেতাদের অভিজাত সংগঠনের অবৈতনিক সভ্য হিসেবে তিনি নির্বাচিত। এ ছাড়া ল্যাটিন, আরব ও সংস্কৃত বর্ণমালার বাছা বাছা অক্ষরের একটা লম্বা ফিরিস্তি বছরে বছরে তাঁর নামের সঙ্গে জোড়া লেগে চলেছে।

অবশ্য মহামান্য মহারাজাধিরাজের স্বপক্ষে এটুকু বলতেই হবে যে যদিও এই সব সম্মানচিহ্ন গ্রহণ করতে তিনি যথেষ্ট ঔদার্যই দেখিয়েছেন এবং যদিও তরুণ বয়সে এই সম্মানচিহ্নগুলি পাবার জন্যে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহও ছিল কিন্তু পরিণত বয়সে এগুলোর সংখ্যাধিক্য দেখে—এবং এগুলোর অধিকাংশই দেওয়া হয়েছে আংরেজি ভাষায় যা তিনি বোঝেন না—এখন এগুলোকে তাঁর কাছে অবান্তর বলেই মনে হয়, এখন এগুলো তাঁর কাছে আধুনিক জীবনযাত্রার একটা প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক মাত্র, যেমন তাঁর পেটেণ্ট চামড়ার জুতো বা মুক্তোখচিত আঠারো-

ক্যারাট সোনার ঘড়ি বা তিনি বিশেষ কোন উপলক্ষে উধমপুরের প্রাচীন রাজকীয় পরিবারের আনুষ্ঠানিক সাজপোশাকের সঙ্গে অঙ্গে ধারণ করে থাকেন।

ব্রিটিশ রাজমুকুটের প্রতি তার আনুগত্য ও ভক্তি সত্ত্বেও *এবং এই আনুগত্য ও ভক্তির জন্যে স্বাভাবিক ভাবেই যেসব বিশেষ* সুযোগসুবিধা তিনি পেয়েছেন পরবর্তী জীবনে তা গ্রহণ করা সত্ত্বেও মহারাজাধিরাজ কখনো অন্তরের সঙ্গে এই নোংরা গোমাংসখোর জাতের—যাদের রাজা পর্যন্ত শৌচকার্যের বদলে কাগজ ব্যবহার করে—সার্বভৌমত্ব স্বীকার করেন নি। তিনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, আপন বংশের মহান ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত। তিনি একথা ভালোভাবেই জানেন যে বিভিন্ন রাজবংশের মধ্যে তাঁর বংশের যে প্রতিষ্ঠা তা পূর্বপুরুষের ঐহিক শক্তির চেয়ে আধ্যাত্মিক শক্তির উপরেই বহুলাংশে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি একটি মাত্র উপাধিকে মূল্যবান মনে করেন, সেটি হচ্ছে 'সূর্যের বংশধর' উপাধি। অন্যান্য সম্মানচিহ্ন সম্পর্কে তাঁর কোন আগ্রহ নেই।

আসল কথা হচ্ছে এই, যতোই তাঁর বয়োবৃদ্ধি হচ্ছে ততোই তাঁর স্পৃহা জাগতিক বস্তুর প্রতি ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে এবং আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু যৌবনে যে-সব অভ্যাস তিনি অর্জন করেছেন এবং রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে যে-সব দায়িত্ব তাঁর আছে তা ঐহিক জীবনের প্রতি বীতরাগ হওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল নয়, সুতরাং তিনি একটা বোঝাপড়া করে নিয়েছেন—আধুনিক জীবন-যাত্রার আনুষঙ্গিকগুলোও যেমন তিনি মেনে নেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য ও সর্বব্যাপী ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস গভীর

করা এবং নশ্বর দেহের কৃত্রিম আবরণকে ত্যাগ করার চেষ্টাও তাঁর আছে।

এখন কথা হচ্ছে এই, সকলেই জানেন যে এই জগতের শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিদের জীবনেও সর্বাত্মক বীতস্পৃহা বা বীতরাগের আদর্শ অর্জন করা সহজসাধ্য হয়নি! ভগবান বুদ্ধ এই জগতকে দুঃখ থেকে ত্রাণ করবার জন্যে সকল স্পৃহার নির্বাণ প্রচার করেছেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হয়েছে জীবাণুযুক্ত মাংসের বিষক্রিয়ায়। আর যীশুখ্রীষ্ট অকারণ কান্না কেঁদেছেন। এবং লাও সি ভুগেছেন পার্থিব জগতের প্রতি আকর্ষণের জন্যে বিবেকের দংশনে ও গেঁটে বাতে।

সুতরাং মহামান্য মহারাজ স্যার গঙ্গা সিংও যদি ঈশ্বরসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে থাকেন তবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। কারণ এই দুষ্ট লৌহযুগ ভারতের সব চেয়ে বীর সন্তানদের জীবনেও কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে। মহারাজার উপরে দু-দিকের দুই চাপ, একদিকে শয়তান সরকার—রাজনৈতিক উপদেষ্টা স্যার ফ্র্যান্সিস্ উইম্পার্লের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে সরকারের সত্যিকারের মনোভাব যে কি তা তিনি সহজে বুঝে উঠতে পারেন না—অন্য দিকে জনসাধারণ, যারা সব সময়েই কিছু না কিছুর জন্যে হৈ-হট্টগোল করে। এই দুই চাপের ফলে মহারাজার জীবনে পুরুষানুক্রমিক আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা বাস্তব করে তোলার পথে দ্বিগুণ অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

যে দুর্ঘটনার ফলে তাঁর মোহমুক্তি ঘটে তা হচ্ছে জগতের ধর্মের ইতিহাসে একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আশ্চর্য ঘটনা। সকল নিষ্ঠাবান ধর্মবিশ্বাসীর কাছে এই ঘটনা লোকপরম্পরায় প্রচারিত। এ ছাড়া, জহর

ব্রতে ও রাণী পদ্মিনীর সতীযজ্ঞের পর রাজস্থানের ইতিবৃত্তে এটি একটি সব চেয়ে বড় আধ্যাত্মিক সংকট তো বটেই। দিল্লীর পরস্বাপহারী দাস-রাজা আলা-উদ্-দিন যখন চিতোরের দুর্গপ্রাকার ঘিরে ফেলেছিল তখন জহর-ব্রত ছিল রাজপুতদের শেষ আত্মদান···রাণী পদ্মিনী বিজয়ীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করার চেয়ে সঙ্গিনীদের নিয়ে সতীযজ্ঞ করে পুড়ে মরেছিলেন।

এখন হল কি, মহারাজার বয়স যখন চল্লিশ এবং তিনি বুঝতে পারছেন যে তিনি বৃদ্ধ হতে চলেছেন তখন তিনি পরলোকযাত্রা সুগম করবার একটি সহজ পথের নির্দেশ পাবার জন্যে উধমপুরের রাজগুরু ও প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত রামপ্রসাদের শরণাপন্ন হলেন।

পণ্ডিত রামপ্রসাদ হচ্ছেন একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ক্ষুদে আইনজীবী, গত সাত বছর ধরে তিনি এই রাজ্যে আপন পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পেরেছেন—অন্য যে-কোন উজীরের তুলনায় এটা দীর্ঘতর স্থায়ী পদাধিকার। তার কারণ, অন্য পারিষদবর্গের চেয়ে তাঁর ধূর্ততা অনেক বেশি! তিনি মহারাজাকে উপদেশ দিলেন যে ধর্মগ্রন্থের মতে প্রতি পূর্ণিমায় মহারাজাকে তাঁর শরীরের সমওজন সোনা ব্রাহ্মণদের দান করতে হবে, রাজপ্রাসাদে সাতশো ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে এবং প্রতিদিন সকালে গঙ্গার ধারে পদ্মাসনে বসে মহারাজার পূর্বপুরুষ সূর্যের উপাসনার পর মালা ঘুরিয়ে তিনশো পঁচাত্তরবার ভগবানের নাম জপে প্রার্থনা করতে হবে। পণ্ডিত রামপ্রসাদ একথাও বললেন যে যদি এই ধর্মানুষ্ঠান ঠিকমত করা না হয় তবে মহারাজার ভীষণ বিপদ, স্বর্গে প্রবেশের কথা যদি ছেড়েও দেওয়া যায়—দীর্ঘ দিন ধরে মহারাজা রোগে ভুগবেন। কারণ মহারাজার ঠিকুজির পাতায় শনি ও শুক্র গ্রহ প্রতিদিনই দারুণ ঠোকাঠুকি করছে।

এদিকে মহারাজার রাজপ্রাসাদ একেবারে রাজপুতনার মরুভূমির ধারে, গঙ্গা এখান থেকে উত্তর দিকে একশো পঞ্চাশ মাইল দূরে। মহারাজা অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই বুঝতে পারলেন না যে কি করে তিনি গঙ্গার ধারে বসে সূর্য-উপাসনা করবেন। কিন্তু মহারাজের তুলনায় পণ্ডিত রামপ্রসাদের উপস্থিত-বুদ্ধি অনেক বেশি প্রখর। শুধু মহারাজা কেন, সত্যি কথা বলতে কি, উধমপুরের অন্য যে-কোন লোকের তুলনায়। তিনি তক্ষুনি সর্দার বাহাদুর সিংকে ডেকে পাঠালেন। এই লোকটি একজন ঠিকাদার, সবচেয়ে বেশি দালালী দেয়। ঠিকাদারের সঙ্গে তিনি বন্দোবস্ত করলেন যে একটা পুকুর কাটাতে হবে এবং গঙ্গানদী প্রথম যেখানে পাহাড় থেকে সমতল ভূমিতে নেমেছে সেই হরিদ্বার থেকে বরাবর নল বসিয়ে গঙ্গাজল এনে পুকুর ভরতে হবে। খরচ পড়বে মাত্র একশো আশি লক্ষ টাকা। মহারাজার কাছে তিনি এই পরিকল্পনা উপস্থিত করলেন।

একথা বলা অনাবশ্যক যে টাকার প্রশ্নটা মহামান্য মহারাজা স্যার গঙ্গা সিং-এর কাছে অবান্তর। সকলেই জানে যে যুদ্ধের সময়ে তিনি সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, চল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন কতকগুলি প্যাকার্ড গাড়ি কিনবার জন্যে। উধমপুরের এবড়োখেবড়ো কাঁচা রাস্তায় চালাতে গিয়ে এই গাড়িগুলোর আবর্তনদণ্ড ভেঙে গেছে এবং গাড়িগুলো এখন আস্তাবলে মরচে-ধরা অবস্থায় পড়ে আছে।

আফিমের ধোঁয়ায় যখন মহারাজার হলদেটে কুঁৎকুতে চোখদুটো আধোঘুমে বুজে এসেছে, গরুর লেজের লোমে তৈরি গদির মধ্যে তিনি আরো গভীর ভাবে ডুবে গেছেন, বাঁকানো রূপোর হাতলওলা লম্বা

রাজকুমার দলটা হাত থেকে খসে পড়েছে; তখন পণ্ডিত রামপ্রসাদ মহারাজার সামনে পরিকল্পনাটি খুলে ধরলেন। মহারাজা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

ভারতে রামরাজ্য নামে এক ধরনের পবিত্র রাষ্ট্রব্যবস্থায় লোকের বিশ্বাস আছে। এই ব্যবস্থায় রাজাকে একটি সুখী পরিবারের বাপ-মা বলে মনে করা হয়, এই সুখী পরিবার বলতে শুধু রাজপরিবারভুক্ত স্ত্রী-পুরুষদেরই বোঝায় না, ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা, উকুন-অধ্যুষিত দেহ সম্বলিত রাজ্যের সাধারণ মানুষগুলো পর্যন্ত এই পরিবারে মধ্যে পড়ে। উধমপুরে প্রবাদ আছে যে মহারাজাধিরাজ থেকে শুরু করে সমস্ত রাজপুতই জ্ঞাতিভ্রাতা, এঁদের সকলেরই একই গোষ্ঠী, বংশ ও জাত। সুতরাং এই রাজ্যে রামরাজ্য সম্পর্কে বিশ্বাস খুবই প্রবল। *যদিও রাজা-প্রজার যে-সম্পর্কের উপর এই বিশ্বাসের ভিত্তি সেটা রাজপ্রাসাদে কোন অভ্যাগত রাজকর্মচারীর সম্মানে জাঁকজমকের সঙ্গে অনুষ্ঠিত ভোজসভায় সব সময় খুব প্রত্যক্ষ নয়,* কিন্তু অন্য অনেক ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে—বিশেষ করে যখন জনসাধারণকে তাঁদের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক অধিশ্বরের সম্মানবৃদ্ধির জন্যে রাষ্ট্রসেবার কোন দায়িত্ব নিয়ে আত্মোৎসর্গ করতে ডাক দেওয়া হয়।

মহারাজা যাতে তাঁর পূর্ব্বপুরুষ সূর্যের উপাসনা ও প্রার্থনা করতে পারেন সেজন্যে রাজপ্রাসাদের কাছে একটি পুকুর খনন করা এবং নল বসিয়ে সেই পুকুরের সঙ্গে গঙ্গার যোগাযোগ স্থাপন করার পরিকল্পনা যখন গৃহীত হল তখন উধমপুরের সকল বয়সের পুরুষ, স্ত্রী এমন কি শিশুদের উপরেও এই নির্মাণকার্যে সহায়তা করবার জন্যে বাধ্যতামূলক আদেশ জারি হল এবং বলা হ'ল যে মহারাজার স্বর্গগমনের পথ সুগম

হবার মত অবস্থা যদি সৃষ্টি হয় তবে সেই পুণ্যফল তারাও প্রকারান্তরে ভোগ করবে।

যদিও উধমপুরে এমন কেউ কেউ ছিল যারা এই পরিকল্পনাকে উদ্ভট মনে করেছে কিন্তু অন্যরা বিশ্বাস করল, যে-মহারাজা কালাপানি পার হয়ে গোমাংসখোর লোকের সঙ্গে হাতে-হাত মিলিয়ে এবং মদ ও মেয়েমানুষ নিয়ে মাতামাতি করে একদিন ধর্ম নষ্ট করেছেন, তিনিই এখন বৃদ্ধ বয়সে আবার সঠিক পথে ফিরে আসছেন। এবং তারা কাজ সম্পূর্ণ করবার জন্যে ঠিকাদারের কাছ থেকে নামমাত্র পারিশ্রমিক নিয়ে, তৃষ্ণার্ত ঠোঁট নেড়ে ভগবানের সহস্র নাম জপ করতে করতে বুনো গাছগাছড়ার শেকড় দিয়ে পেট ভরিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, স্বেচ্ছায় নিদারুণ পরিশ্রম করতে লাগল।

হরিদ্বার থেকে উধমপুর পর্যন্ত লম্বা পাইপ বসাতে এবং তিন ধাপ সিঁড়ি বসানো এক সুন্দর চৌকোণো পুকুর তৈরি এবং প্রাসাদ ও পুকুরের যোগাযোগ স্থাপন করতে অনেক মাস সময় লাগল না।

হৃদয়ের যে ঔদার্য মহারাজার পারিবারিক বৈশিষ্ট্য, যেজন্যে শত্রুর প্রতি তাঁর তীব্রতম ঘৃণা এবং অনুগ্রহণভাজনের প্রতি কোমলতম অনুকম্পা—তারই ফলে যারা পুকুর তৈরির পরিকল্পনাকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিল তাদের উপর মহারাজা বেত্রদণ্ড ও নির্বাসনের আদেশ দিলেন এবং যাদের সহায়তায় নির্ধারিত অনুষ্ঠান সম্পন্ন কববার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তাদের ভোজ দিলেন। সুতরাং উধমপুরে যেমন কান্নার রোলও কিছুটা উঠল তেমনি আবার আনন্দেরও ধুম পড়ল এবং এ সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়, হাসি ও চিৎকারে চোখের জল তলিয়ে গেল।

উৎসবের পর কয়েকদিন পর্যন্ত মহারাজা তাঁর পিতৃপুরুষ সূর্যের উপাসনা ও আরাধনা করবার নির্ধারিত ক্রিয়াকলাপ অভ্যাস করা শুরু করতে পারলেন না। তার কারণ পুষ্করিণী স্থাপনের পুণ্য উপলক্ষে যে ভোজ হয়েছে তার পরে প্রতিদিন ভোরে প্রার্থনা করবার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে মনঃসংযোগ করা তাঁর পক্ষে দুরূহ মনে হল। বিশেষ করে মহারাজার কোন কালেই ভোরে ওঠার অভ্যাস নেই, আরও একটা কারণ এই যে ভোজসভার গুরুপাক খাদ্যের যে ক্রিয়া তাঁর যকৃতের উপর হয়েছে তার পরে তিনি বিশেষ সুস্থ বোধ করছিলেন না।

কয়েক পুরিয়া হজমি গুঁড়ো খাবার পরে যখন যকৃতের স্বাভাবিক অবস্থা কিছুটা ফিরে এসেছে তখন মহারাজার বাঁ পায়ে ধরল বাত। এবং এর পরে, গরুর লেজের লোমে তৈরী যে ভেল্‌ভেটের গদির উপব মহারাজা বিশ্রাম করতেন সেখান থেকে নড়াচড়া করা তার পক্ষে শক্ত হয়ে পড়ল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কাশ্মিরী শাল মুড়ি দিয়ে তিনি পড়ে রইলেন।

স্বর্গরাজ্যের সন্ধান শুরু করার কাজে এই বাধ্যতামূলক বিলম্বের ফলে সৌভাগ্যবশত মহারাজা কিছুটা সময় পেলেন এবং এই সময় তিনি উপাসনা শুরু করার আগে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে নিজের মনকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারলেন।

মনে মনে তিনি প্রশ্ন করলেন, তাঁর ছোট রাণী যে বলে তাঁর উচিত তাঁর চিবুকের দু-দিকে প্রসারিত সযত্নলালিত দাড়ি ছেঁটে ফেলা—কথাটা কি ঠিক নয়? পুষ্করিণী খননকার্যের উদ্বোধন উপলক্ষে নেপালের এক রাজপুত্র প্রেরিত পাল্‌কি চেপে এই ছোট রাণীটি এসেছেন। আচ্ছা, এই দাড়ি আছে বলে সত্যিই কি তাঁকে বুড়ো দেখায়? আর একথা

কি সত্যি যে আংরেজিলোক যাট বছর বয়সের পুরুষকেও ছোক্‌রা মনে করে? তাঁর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক সেনাপতি ভোলা সিং যে-কথা বলেছে— কোন পুরুষ শূকরের যৌন-অঙ্গের মাংস গুঁড়ো করে জল দিয়ে গুলে খেয়ে ফেললেই পুনর্যৌবন লাভ করা যায়, এমন কি সন্তানের পিতাও হওয়া যায়—তা যদি সত্যি হয় তবে তাঁর ভাবনা কি, চল্লিশ বছর বয়সেই কেন তিনি হতাশ হবেন বা বুড়ো হয়ে গেছেন মনে করবেন? শুধু তাঁর শিকারীর দলকে একটা পুরুষ শূকর শিকার করতে পাঠালেই তো হয়ে যায়।···কেন মিথ্যে এসব উপাসনা ও প্রার্থনার ঝক্কি নেওয়া? আর যখন সামান্য কিছু অর্থ দান করলেই পুরুতদের দিয়ে সমস্ত মন্ত্র পাঠ করিয়ে নেওয়া যায়, এমন কি তাদের দিয়ে একথাও বলিয়ে নেওয়া যায় যে এক হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন ও পূজায় কিছু নৈবেদ্য দান করলেই নিশ্চিত স্বর্গপ্রাপ্তি। মন্ত্রতন্ত্র কোন দিন তিনি শেখেননি, আর যদি সত্যি সত্যিই তাঁকে শেষ পর্যন্ত ভোরবেলা উঠে পুকুরের ধারে যেতে হয় তাহলে তিনি আকাশের দিকে জল ছুঁড়ে সূর্যের উদ্দেশ্যে বলবেনই বা কি? যতই তিনি কুশানে হেলান দিয়ে এসব কথা ভাবতে লাগলেন এবং যতই তার বাতের ব্যথা বাড়তে লাগল ততোই এ-ধরনের সন্দেহ ও দুশ্চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তিনি ডান হাতের উপর মাথা ঠেস দিয়ে বাঁ হাতের তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে দাড়ি মোচড়াতে লাগলেন। কিন্তু গড়গড়ার কল্‌কেতে অফিং ও তামাকের চমৎকার মেশালটুকু তার সমস্ত চিন্তা দূর করে দিল এবং এই বিশ্রী কাজটা তিনি দিনের পর দিন মলতুবী রেখে চললেন।

কিন্তু যে কারণেই হোক পণ্ডিত রামপ্রসাদ মহারাজাকে অতিষ্ঠ

করে তুলতে লাগলেন, বারবার তিনি খোঁজ করতে লাগলেন কবে মহারাজা নির্ধারিত উপাসনা শুরু করবেন। প্রধানমন্ত্রী বললেন যে মহারাজার ঠিকুজির পাতায় শুক্র ও শনি গ্রহের ঠোকাঠুকি তো আছেই তাছাড়া হরিদ্বার থেকে নল বসাতে গিয়ে রাজকোষের সমস্ত অর্থই প্রায় নিঃশেষিত। এখন চাষীদের কাছ থেকে নতুন কর আদায় করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে যে করে হোক তাদের বোঝানো যে মহারাজা যদি উপাসনা করেন তবে সমস্ত রাজ্যেরই মঙ্গল, অন্য কেউ করলে তা হবে না। লোকটা কিছুতেই থামতে চায় না, তার তর্জনগর্জন শুনে মহারাজার প্রায় কানে তালা লাগবার উপক্রম। আর এবারে সে কিছুতেই স্বর্গলাভের অন্য কোন উপায় দেখাতে রাজি নয় যদিও আগের বারে সে বলেছিল যে তেমন জরুরি অবস্থা হলে খুব কড়াকড়ি বিধিনিষেধ না মানলেও চলে, সাতশো ব্রাহ্মণ ভোজনই যথেষ্ট।

শরীর অসুস্থতার ভান, মন্ত্রতন্ত্র না-জানা ইত্যাদি কোন কথাই টিকল না। মহারাজাকে বোঝানো হল যে মনের পবিত্রতা অর্জন করতে পারলেই তিনি স্বাস্থ্য ফিরে পাবেন। এবং যেহেতু মহারাজা একথা স্পষ্ট স্বীকার করতে পারলেন না যে ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি তাঁর অনুৎসাহের আসল কারণ—তিনি নিজে বুড়ো ও অথর্ব হয়ে গেছেন, এখন তাঁর পক্ষে শুধু বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়াই সাজে, একথা মনে করবার আগে তিনি আরেকবার শেষবারের মত দেখে নিতে চান—সুতরাং তিনি একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়লেন।

তারপর একদিন সত্যি সত্যিই তিনি রাজোচিত ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং জানিয়ে দিলেন যে তিনি হচ্ছেন সূর্যের বংশধর সুতরাং পূর্বপুরুষের পুনজন্ম লাভ করবার জন্যে তাঁকে মন্ত্র আওড়াতে হবে না

এবং কোন কুত্তার বাচ্চা বামুনই তাঁকে দিয়ে এই চল্লিশ বছর বয়সে বৈরাগ্য নেওয়াতে পারবে না।

কিন্তু পণ্ডিত রামপ্রসাদ তাঁকে অত্যন্ত বিনীতভাবে জানিয়ে দিলেন যে যদি রাজকোষের সমস্ত অর্থ এইভাবে ব্যয় করবার পরেও তিনি সম্পূর্ণভাবে ধর্মানুরক্ত না হন্ এবং যদি প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্বেও তিনি প্রজার স্বার্থ সর্বপ্রযত্নে বজায় রেখে অবাধে রাজ্যশাসন করতে না পারেন তবে তিনি রাজকোষ দেউলিয়া ঘোষণা করে বৃটিশ সরকারের কাছে আর্জি করবেন যেন মহারাজাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করিয়ে শাসনপরিষদ নিযুক্ত করা হয়।

এই ভীতিপ্রদর্শনের পর নতি স্বীকার ছাড়া মহারাজার অন্য কোন উপায় ছিল না। তবুও তিনি এই বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে কিছু দিনের সময় চেয়ে নিলেন যে উপাসনা শুরু করবার আগে তিনি গায়ত্রীর কথাগুলো ও সূর্যমন্ত্র ভালো করে শিখে নিতে চান। কিন্তু আসলে তাঁর চেষ্টা ছিল এই প্রাণান্তকর ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়া—কিছুদিন সময় পেলে এমন কিছুও তো ঘটতে পারে যে তা সম্ভব হবে।

পণ্ডিত রামপ্রসাদ মহারাজাকে গায়ত্রী মুখস্ত করাবার জন্যে একজন পুরোহিত নিযুক্ত করলেন। বাধ্য হয়ে মহারাজাকে অসংখ্যবার এই মন্ত্র আবৃত্তি শুনতে হল। সমস্ত মন্ত্রটা ভালো ভাবে মুখস্ত হবার অনেক আগেই তিনি ভান করলেন যে মন্ত্রটা শেখা হয়ে গেছে—কারণ প্রধানমন্ত্রীর এই হাড়জ্বালানো অনুচরটিকে রাজপ্রাসাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার এই ছিল একমাত্র পথ।

অবশেষে দিন ঠিক করা হল, যে-দিনে মহারাজা পুকুরের ধারে

বসে উপাসনা করবেন এবং সেই উপাসনায় তাঁর ও প্রজাবৃন্দের মঙ্গল হবে।

ঢাক-ঢোল খোল-করতাল, কাসর-ঘণ্টা-শাঁখ বেজে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা প্রিয় সঙ্গিনীর শর্যাপার্শ্ব থেকে উঠলেন। তখনো তিনি বাতে ভুগছেন, পায়ে পটি বাঁধা, সেই অবস্থায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে নীচে নামলেন। তাঁর শোবার ঘরের বারান্দা থেকে পুকুরের ধার পর্যন্ত তিন ধাপ সিঁড়ি, সেখানে পণ্ডিত রামপ্রাসাদ, পরিষদবর্গ ও জনসাধারণ তাঁর আগেই জড়ো হয়েছেন—তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে তিনি সেখানে গেলেন।

পূর্বাকাশ তখন গোলাপের মত আরক্ত, মহারাজা স্যার গঙ্গা সিং-এর পূর্বপুরুষ সূর্যের প্রদীপ্ত মুখাবয়ব মরুভূমির ওপাশে পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে।

পুকুরের পবিত্র জলে সমবেত জনমণ্ডলী আনুষ্ঠানিক স্নান করল, তারপরে রাজ্যের প্রধান পুরোহিত হিসেবে পণ্ডিত রামপ্রসাদ উপাসনা পরিচালনা করলেন।

প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য পুরোহিতরা পুকুরের তৃতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে অঞ্জলি করে জল নিচ্ছেন এবং গায়ত্রী উচ্চারণ করতে করতে সেই জল সূর্যের উদ্দেশে সামনের দিকে ঢেলে দিচ্ছেন।

মহারাজা কেমন যেন আবিষ্টভাবে পুরোহিতদের অনুকরণ করতে লাগলেন—দেখে মনে হচ্ছে যেন রাত্রিবেলার ঘুমে মহারাজার চোখ থেকে ঘুম সম্পূর্ণ দূর হয়নি।

মন্ত্র আবৃত্তি হবার পর সমবেত জনমণ্ডলী পুকুরের সব চেয়ে নীচের ধাপে পদ্মাসনে বসল। এবার ভগবদ গীতার অংশ পাঠ হবে এবং

চোখ বুজে নিজের অন্তরের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করতে হবে— হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানের এই হচ্ছে রীতি।

মহারাজার ভয় ছিল যে যদি তিনি ভগবানকে উপলব্ধি করতে গিয়ে ভালোভাবে চোখ বোজেন তবে হয়ত তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন এবং পুকুরের জলে ঢলে পড়বেন। সুতরাং ঢলে না পড়ে আসনের উপর যাতে সোজা হয়ে বসে থাকতে পারেন এইজন্যেই তাঁকে খুব সতর্ক থাকতে হল। এইভাবে যখন তিনি একবার করে চোখ খুলছেন এবং আবার বন্ধ করছেন সেই সময় তাঁর চোখে পড়ল যেন একটা গোলাকার সবুজ শ্যাওলার টুকরো ফুলের পাপড়িগুলোর ধারে ধারে এবং যেখানে মন্ত্র আবৃত্তির সময় সমবেত জনমণ্ডলী অপর্যাপ্ত চাল ছড়িয়েছে তার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে।

পুরোহিতদের অবিশ্রান্ত মন্ত্রোচ্চারণের গুঞ্জন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে, প্রায় আধো ঘুমন্ত অবস্থা থেকে সজাগ হয়ে উঠে মহারাজা সোজাসুজি চোখ মেলে তাকিয়ে চারদিক দেখতে লাগলেন। যারা এই পুকুর তৈরির কাজে সাহায্য করেছে তাঁর সেই লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রজা চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে। দেখে মনে হয়, আপন উপস্থিতির দ্বারা তিনি যে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বাড়িয়েছেন তারাও তাতে যোগ দিতে পেরেছে বলে খুব খুশি।

কেউ দেখে ফেলতে পারে এই ভেবে তিনি আবার মাথা নীচু করলেন। সেই অদ্ভুত শ্যাওলার টুকরো এবার ভাসতে ভাসতে তার পটিবাধা পায়ের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। প্রাসাদের নাপিত তার পায়ে একটা সবুজ ওষুধের প্রলেপ লাগিয়ে দিয়েছিল। পায়ের পটির ফাঁক দিয়ে সেই নোংরা সবুজ প্রলেপ দেখা যাচ্ছে আর শ্যাওলার

টুকরোটা যেন সেই প্রলেপের টানেই এগিয়ে এসেছে। নোংরা বস্তুটা দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে মহারাজা হাত নাড়তে পারছিলেন না, কারণ তাঁর হাতদুটো নির্ধারিত ভঙ্গিতে পদ্মফুলের প্রস্ফুটিত পাপড়ির মত অবস্থায় জানুর উপর স্থাপিত। এদিকে তার ইচ্ছাও নয় যে নোংরা বস্তুটা তাঁর বাতগ্রস্ত পায়ে এসে লাগে। একটু নড়েচড়ে বসবার সাহসও তার নেই পাছে পণ্ডিত রামপ্রসাদ পরে তাকে তাঁর অমনোযোগিতার জন্যে তিরস্কার করেন। কিন্তু তবুও একটা কিছু না করেও তিনি থাকতে পারছিলেন না। আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে তিনি ভাবলেন যে পা দিয়ে সামান্য একটু ঠেলে তিনি নোংরা বস্তুটাকে সরিয়ে দিতে পারবেন এবং তাতে সমবেত জনতার বা পুরোহিতদের কারও চোখ পড়বে না।

জলের ভিতরে বাঁ পাটা দিয়ে চকিতে একটু ঠেলা দিয়ে তিনি চোখ বুজলেন, তাঁর নিশ্চিত ধারণা যে তিনি নিজে যদি পায়ের ভঙ্গিটুকু না দেখতে পান তাহলে অন্য কেউও তা দেখবে না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলের কাছে একটা তীব্র ব্যথা ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল। দুই চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে তিনি বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে ধরলেন।

লালচে রংয়ের ফ্যাকাশে এক টুকরো মাংস চোখের সামনে ভাসছে এবং বুড়ো আঙুলের কাছে পটির ভিতর থেকে ছোটখাটো ফোয়ারার মত রক্তের স্রোত বেরিয়ে আসছে।

'কচ্ছপ! কচ্ছপ!' বলে চিৎকার করতে করতে পুরোহিতের দল দু-হাত উপরে তুলে হুড়মুড় করে ছুটল পিছন দিকে।

'কচ্ছপটা মহারাজের বুড়ো আঙুল কামড়ে নিয়েছে!' চিৎকার

ক'রে একজন পারিষদ মাংসের টুকরোটা তুলে নিল, অপসৃয়মান কচ্ছপটার সঙ্গে সঙ্গে মাংসের টুকরোটাও ে.নিয়ে যাচ্ছিল।

'খুন! খুন!' আরেকজন পারিষদ চিৎকার করে উঠল!

'রক্ত!' তৃতীয় একজন চিৎকার করছে।

'আস্তে! চুপ করো সব!' মহারাজা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর কিছুটা ভয় ছিল যে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে তার এই অসঙ্গত আচরণের দ্বারা অনুষ্ঠান পণ্ড করবার জন্যে তিরস্কার করবেন এবং তার লক্ষ লক্ষ প্রজা এই অশুভ দুর্ঘটনাকে অমঙ্গলসূচক মনে করবে।

কিন্তু আতঙ্কগ্রস্থ পুরোহিতের দল ও ভীরু পারিষদবর্গ পালিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রাসাদের সিঁড়ির ওপরে। পুকুরের অন্য দিকে যারা দলে দলে ভিড় করে ছিল তাঁদের মধ্য থেকে 'রাম! রাম! হরি! হরি!' চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কারণ, পুকুরের তিনটে ধাপের উপর যে প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল চলছিল তা দেখে সবারই বিশ্বাস হয়েছে যে মহারাজাকে নিয়ে একটা কিছু অশুভ ঘটনা ঘটেছে।

মহারাজা যেখানে ছিলেন সেখানেই উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর ভঙ্গিতে রাজোচিত মর্যাদাবোধ ফিরে এসেছে। যন্ত্রণায় বিকৃত ও বিবর্ণ মুখ, তবুও তিনি আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাতদুটো প্রসারিত করে দিলেন— যেন তাঁর প্রজাবৃন্দ বুঝতে পারে যে যদিও তাঁর পারিষদবর্গ আতঙ্কে পালিয়েছে কিন্তু তিনি অবিচলিত আছেন।

নিজের এই স্থৈর্য দেখে তিনি নিজেই অবাক হলেন এবং তখন তাঁর রাজোচিত মর্যাদাবোধ আরও তীব্র হল। সিঁড়ির প্রথম ধাপে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত রামপ্রসাদ দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর শরীরের ছায়া এসে

পড়েছিল মহারাজার গায়ের উপরে—অপরাধীর দিকে তাকাবার দৃষ্টি নিয়ে মহারাজা এসে দাঁড়ালেন সামনাসামনি।

'শূয়োরটাকে পাকড়াও করতে হবে। যে ডাকাতটা আমার বুড়ো আঙুল নিয়ে পালিয়ে গেল তাকে এক্ষুনি ধরে আন!' মহারাজা চিৎকার ক'রে বললেন: 'অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমার ঐ কুপরামর্শ শুনেছি বলেই আমার এই দশা...যদি দোষীকে ধরতে না পার এবং অপরাধীর যদি শাস্তি না হয় তবে তোমার মাথা গুঁড়ো করে দেব!'

তারপর, প্রধান মন্ত্রীকে শাসাতে শাসাতে, অপস্রিয়মান মূর্তিগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে, চিৎকার গালাগালি বিলাপ আর্তনাদ করতে করতে তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তিন ধাপ উপরে উঠলেন এবং মার্বেল পাথরের মেঝের উপরে মুখ থুবরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

অন্দরমহলের স্ত্রীলোকেরা বারান্দায় কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এল, প্রাসাদে ও রাজধানীতে শোকের ছায়া পড়ল যেন মহারাজা মরে গেছেন বা মরতে চলেছেন।

কিন্তু মহারাজার প্রিয় ছোট রাণীর শিরায় শিরায় হিমালয় দেশের রক্ত, তিনি একটুও ভয় পেলেন না, মহারাজার ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নিজের নামে তিনি একটি ঘোষণা জারি করলেন। সেই ঘোষণায় তিনি দুর্ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানালেন, জনসাধারণকে আশ্বাস দিলেন যে মহারাজা দ্রুত আরোগ্য পথে এবং মহারাজা শীঘ্রই আরোগ্য লাভ করে তাঁর জীবননাশের চেষ্টার জন্যে দায়ী অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তিবিধান করবেন।

প্রধানমন্ত্রী এবার বুঝতে পারলেন যে স্বর্গরাজ্যের সুযোগ-সুবিধার

প্রতি মহারাজার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়ে তার পার্থিব রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তারপর তাঁর মনে পড়ল যে কচ্ছপ কামড়িয়ে যাবার পর তীব্রতম যন্ত্রনার মুহূর্তেও, যখন তিনি ও অন্যান্য পারিষদবর্গ সিঁড়ির উপরের ধাপে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে এসেছিলেন তখনো তিনি ধৈর্য হারাননি। কথাটা মনে হতেই এই দুর্বল অফিংখোর মহারাজা সম্পর্কে—যাকে তিনি মনে করতেন যে মোমের পিণ্ডের মত ইচ্ছামত বাঁকাতে চোরাতে পারবেন—তার কেমন ভয় হল। অপরাধী কচ্ছপকে যদি তিনি হাজির করতে না পারেন তবে এই রাজপুত মহারাজা যে তার উপর কি প্রতিফল নেবেন তা তিনি ভাবতেও পারলেন না। আর তাছাড়া একটা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর উপর কী আর প্রতিশোধ নেওয়া যায়? সরীসৃপটা কি খুন করেছে? কিন্তু একথা ভেবে এখন আর কোন সান্ত্বনা নেই, আর একথাও তো ঠিক যে অধিকাংশ জলচর প্রাণীর শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা। সংজ্ঞাহীন হবার আগে মহারাজা যে সব কথা বলেছেন তা তো আছেই, তাছাড়া ছোট রাণীর চালচলনটাও মারাত্মক।

যে কচ্ছপটা মহারাজার ডান পায়ের বুড়ো আঙুল কামড়িয়ে নিয়েছে সেটাকে জাল ফেলে ধরবার জন্যে গাঁয়ের জেলেদের তিনি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন। তিনি একথাও জানিয়ে দিলেন, সরীসৃপটাকে যে মৃত অবস্থায় হাজির করতে পারবে তাকে এক টাকা আর যে জীবন্ত অবস্থায় হাজির করতে পারবে তাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই পুরস্কারের দাবিদাররা হাজির হতে খুব বেশি সময় নিল না। এক ঘণ্টা পার হতে না হতেই জেলেরা জীবিত ও মৃত ঝুড়িভর্তি কচ্ছপ এনে হাজির করল, আর এই ঝুড়ি ঝুড়ি কচ্ছপের মধ্যে ঠিক

কোন্‌টি যে মহারাজার ডান পায়ে কামড়িয়েছে তা যে কি করে ঠিক করবেন তা ভেবে প্রধানমন্ত্রী রীতিমত সমস্যায় পড়লেন! মুহূর্তের জন্যে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু কূটনীতির যেটা গোপন কথা —অর্থাৎ, নতুন নতুন ফন্দি বার করার মত প্রতিভা রাখা—সেটা তাঁর ছিল এবং তিনি একটি মাত্র কচ্ছপ রেখে বাকিগুলোকে আবার পুকুরে ছেড়ে দিলেন। তারপর মহারাজার সামনে উপস্থিত হয়ে কপট বিনয়ের সঙ্গে প্রণাম করে বললেন: 'মহারাজার আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে। কচ্ছপটা ধরা পড়েছে। এবার মহারাজার কি আদেশ বলুন?'

মহারাজা স্যার গঙ্গা সিং-এর রাজোচিত মর্যাদাবোধ প্রিয় সঙ্গিনীর পরিচর্যায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল এবং তা ক্রমে একটা ক্ষুণ্ণ গৌরবের অনমনীয় মনোভাবের আকারে দানা বেঁধে উঠছে। প্রধানমন্ত্রীর উপর মহারাজা তর্জন করে উঠলেন:

'ব্যাটা হারামজাদা কচ্ছপটাকে বিচার সভায় নিয়ে চলো, সেখানে আমার সামনে ওর বিচার হবে। ওটার এবং অন্য সমস্ত অপরাধীর উপযুক্ত শাস্তি হওয়া চাই!...'

বিচার সভায় মহারাজা কচ্ছপের বিচার করবেন, এটা শুনতেই হাস্যকর মনে হচ্ছিল। কিন্তু মহারাজার অদ্ভুত সব খামখেয়ালীর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পরিচিত ছিলেন। তিনি চুপ ক'রে রইলেন এবং বিচার সভায় কচ্ছপটাকে নিয়ে এলেন।

ঝুড়ির মধ্যে সরীসৃপটাকে মাথা নাড়াতে দেখে মহারাজা রাগে দাঁত কড়মড় করে ফুঁশতে ফুঁশতে গর্জে উঠলেন:

'ওটাকে এখানে নিয়ে এস, ও আমার যে পা-টা খোঁড়া করেছে সেই পায়ে আমি ওকে মাড়াব!'

'হুজুর,' প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দিলেন: 'ওটার কিন্তু ছুরির মত ধারালো দাঁত আছে, সেই দাঁতের এক কামড়ে মহারাজের গোটা পা-টাই খসে যেতে পারে।'

একথা শুনে মহারাজা সংযত হলেন, আইনের ভার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের হাতে তুলে নিলেন না। কিন্তু মহাসমারোহে তিনি এই ঘোষণা করলেন:

'আমরা, সূর্যবংশী গোষ্ঠীর বংশধর, উধমপুরের মহারাজাধিরাজ গঙ্গা সিং—আমরা ঘোষণা করছি যে আমরা হচ্ছি এই বিচার সভার সর্বোচ্চ বিচারক এবং আমরাই এই মামলার বাদী ও ফরিয়াদী। যে হতভাগা কচ্ছপটা আমার বুড়ো আঙুল কামড়িয়েছে তার স্বপক্ষে যদি কারও কিছু বলার সাহস থাকে তো এগিয়ে আসুক! কিন্তু একথা স্পষ্ট জেনে রাখতে হবে যে যদি উপরোক্ত কচ্ছপের অপরাধ প্রমাণিত হয় তবে এই মুহূর্তে আমাদের উপস্থিতিতে কচ্ছপ ও তার পক্ষ সমর্থনকারী সরীসৃপের শিরচ্ছেদ করা হবে।'

মহারাজার রক্তবর্ণ চোখ ও উচ্চকণ্ঠ কর্কশ উচ্চারণ শুনে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে এগুলো হচ্ছে গত ইউরোপ ভ্রমণের সময় মহারাজা যে-সব ফ্যাশিস্ট রাষ্ট্রে ঘুরেছেন সেখানকার সরকারী অভিযোক্তাদের উগ্র ও ঝাঁকালো ভাবভঙ্গি অনুকরণের চেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন: 'আমি আসামীর পক্ষ সমর্থন করব।'

বৃহৎ কক্ষের মধ্যে অনুকম্পা, অনুশোচনা ও আনন্দের ফিসফিসানি শোনা গেল—কারণ অভিজাতবর্গ, পারিষদবর্গ ও অনুচরবর্গের বদ্ধমূল ধারণা যে মহারাজার পটিবাধা রক্তস্রাবী বুড়ো আঙুলটাই কচ্ছপের অপরাধের নিশ্চিন্ততম প্রমাণ! এবং এই অপরাধ প্রমাণিত হবার পরে

সরীসৃপটির পক্ষসমর্থনের অবিমৃষ্যকারীতার জন্যে প্রধানমন্ত্রীও মুশকিলে পড়বেন।

'আচ্ছা বেশ, কোন্ কুত্তার বাচ্চা বামুন বলতে চায়, বলুক।' মহারাজা গর্জে উঠলেন। পায়ের ব্যথা বাড়ার সঙ্গে তাঁর রাগও চড়ছে, শ্রোতাদের সব চেয়ে বড় ভয় যেটা ছিল তাই যে ঠিক তা বোঝা গেল।

'হুজুর, আপনি আমার বাপ-মা,' মহারাজার তর্জন-গর্জনে কিছুমাত্র দমে না গিয়ে চতুর রামপ্রসাদ বলে চললেন : 'আপনি আমার বাপ-মা কারণ আপনি এই দেশের সকল প্রজার বাপ-মা। কিন্তু এই পুষ্করিনী নির্মাণকার্যে আমিই মহারাজাকে উৎসাহ দিয়েছি এবং এজন্যে আমিই দায়ী—সুতরাং এ-বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে।'

'কি বক্তব্য শুনি!' মহারাজা বললেন।

'হুজুর!' তোষামোদ করবার অতি-প্রচলিত ও অতি প্রাচীন ভঙ্গিতে প্রধানমন্ত্রী বলে চললেন : 'আপনি হচ্ছেন সূর্যের বংশধর, সুতরাং দেশের মধ্যে আপনিই সব চেয়ে বড় ও সব চেয়ে পরাক্রান্ত মহারাজা। আপনার উপদেশ পৃথিবীর দূর দূর দেশের লোকেও শোনে, পৃথিবীর দূরতম অংশেও আপনার খ্যাতি ছড়িয়েছে—এমন কি আপনি যে চির-বরফ ও চির-তুষারের দেশে ঘুরে এসেছেন, সেখানেও। কিন্তু মহারাজ একটি কথা অনুগ্রহ করে শুনুন—শাস্ত্রে লেখা আছে যে ব্রাহ্মণ হত্যা পাপ, ব্রাহ্মণ হত্যাকারীকে কুড়িবার দুঃসহ নরক ভোগ করতে হয়। সুতরাং দেশের ছোট-বড় সকলের কাছেই আমি অবধ্য।'

চার হাজার বছরের পুরানো মনুর বিধানের সাহায্যে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কচ্ছপের স্বপক্ষে তিনি তার নিজস্ব

ধর্মীয়-মোক্তারী জ্ঞান প্রয়োগ করলেন : 'মনুর এই বিধান ভারত-সরকার কর্তৃক আংশিক এবং বলা বাহুল্য, দেশীয় রাজ্য কর্তৃক পুরোপুরি স্বীকৃত।...

'এই সরীসৃপটি সম্পর্কে এই কথাই বলা চলে, প্রাচীন ঋষিরা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে গেছেন যে লৌহযুগে ভগবান বিষ্ণু কচ্ছপের রূপ ধারণ ক'রে জন্মগ্রহণ করবেন এবং কোন এক সূর্যের বংশধরের দ্বারা তারই উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে নির্মিত ভূগর্ভস্থ নালিপথ দিয়ে এক পুকুরে স্থানান্তরিত হবেন। আর তারপর সেই সূর্য বংশধরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি উৎসর্গ করতে হবে এবং সেটাই হবে প্রথম নিদর্শন যে সূর্যের আদি পুরুষ ভগবান বিষ্ণু রাজস্থানের এই প্রাচীন রাজ্যে পুনরায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এই ঘটনার পরে দেশে রামরাজ্য ও আদর্শ রাজ্যচালনার প্রাচীন আদর্শ বাস্তবে পরিণত হবে...'

তারপরে তিনি বললেন যে মহারাজা যদি এই নিদর্শনকে মেনে নেন এবং যাদের তিনি শত্রু বলে বিবেচনা করছেন তাদের ক্ষমা করেন তাহলে ছোট রাণীর গর্ভে তিনি একটি পুত্রসন্তান ও উত্তরাধিকারী লাভ করবেন ও তাঁর স্বর্গযাত্রার পথ বাধাহীন হবে। আর তা যদি না করেন তাহলে শেষ দিন পর্যন্ত মহারাজার জীবন অভিশপ্ত হয়ে উঠবে, তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে এবং চিরকালের জন্যে সূর্যবংশী গোষ্ঠি লোপ পাবে...

'বিষ্ণুর অবতার!' বিদ্রূপের স্বরে একজন পারিষদ বললেন। এই পারিষদটির প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভের উচ্চাশা ছিল, সুতরাং পণ্ডিত রামপ্রসাদকে তিনি ঘৃণা করতেন এবং পণ্ডিত রামপ্রসাদের কারসাজি বার করে ধরে বললেন : 'বিষ্ণুর অবতার না শয়তানের অবতার! যে

কচ্ছপটা মহারাজাকে সারা জীবনের মত পঙ্গু করে দিয়ে গেল সেটা হল গিয়ে কিনা ভগবানের বাহন!'

প্রধানমন্ত্রীর ব্যাখ্যা শুনে মহারাজা আত্মগর্বে ফুলে উঠলেন। কিন্তু আহত পায়ের যন্ত্রণায় তার প্রায় পাগল হয়ে যাবার মত অবস্থা, ফোঁস ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে তিনি যে কুশানের উপরে শুয়েছিলেন তার উপরে উন্মত্ত অস্থিরতায় এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন।

মহারাজার মনকে নিজের স্বপক্ষে আনবার জন্যে পণ্ডিত রামপ্রসাদ বললেন: 'অমঙ্গল সম্পর্কে আপনাকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক ক'রে দেওয়া আমার বিশেষ একটা কর্তব্য, আমি তা পালন করেছি।'

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বী পারিষদটি বললেন: 'পুকুরের সমস্ত কচ্ছপের মধ্যে এই কচ্ছপটিই বিষ্ণুর অবতার তার কি প্রমাণ আছে?'

প্রধানমন্ত্রী সমানে জবাব দিলেন: 'ঠিক এই কচ্ছপটি যে মহারাজার বুড়ো আঙুল কামড়িয়ে নিয়েছে তারই বা কি প্রমাণ আছে?'

মহারাজাকে দেখে মনে হল যে প্রধানমন্ত্রীর যুক্তি শুনে তিনি অভিভূত হয়েছেন।

দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে তিনি বললেন: 'ঠিকই তো, পণ্ডিত রামপ্রসাদ ঠিক কথাই বলেছেন মনে হয়। যে অমঙ্গলের কথা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে প্রচলিত গল্পের মিল আছে—সূর্য রাজবংশী গোষ্ঠির প্রত্যেক বংশধরের কাছে ভগবান উপস্থিত হন।'

প্রধানমন্ত্রীর শত্রু বললেন: 'কিন্তু হুজুর, এই দৈব ঘটনাটি যে ঠিক এই-ভাবেই ঘটবে তার কি প্রমাণ? কোন্ শাস্ত্রে এসব কথা লেখা আছে?'

'পণ্ডিত রামপ্রসাদ একজন উজীর তো বটেই, তা ছাড়া তিনি

একজন পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণ।' কথাটা বলল প্রধানমন্ত্রীর পক্ষাবলম্বী একজন।

তারপর শুরু হল কথা কাটাকাটি, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি-বিনিময়। সকলের মেজাজ সপ্তমে উঠবার উপক্রম, শুধু মহারাজার শরীরের অবস্থার জন্যেই তা হতে পারল না।

অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে মহারাজা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন: 'পণ্ডিতজী, এই অবস্থায় আমি কি রায় দেব বলুন।'

প্রধানমন্ত্রী বললেন: 'আমার পরামর্শ হচ্ছে এই—এই কচ্ছপটি যেখান থেকে এসেছে সেই গঙ্গানদীতেই আবার একে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার আদেশ দিন। তাহলে আমি যে-কথা বলেছি কচ্ছপটি হচ্ছে ভগবান বিষ্ণুর অবতার—সে-কথা যদি সত্যি হয় তাহলে কচ্ছপটি আবার ফিরে আসবে এবং স্বরূপ প্রকাশ করবে!'

মহারাজার চিন্তাধারার কাছে এই কার্যক্রম যুক্তিযুক্ত মনে হল। কচ্ছপটি যদি সত্যিই ভগবান বিষ্ণু হন, তাহলে তিনি আবার ফিরে আসবেন এবং স্বরূপ প্রকাশ করবার জন্যে কিছু একটা করবেন—যদিও কচ্ছপটি গতবারে যে-ভাবে স্বরূপ প্রকাশ করেছে এবারেও ঠিক সেই ভাবেই করুক তা তিনি পছন্দ করেন না। আর যদি এটা শুধু একটা কচ্ছপ ছাড়া অন্য কিছু না হয় তাহলে হতচ্ছাড়াটাকে বিদেয় করবার এই হচ্ছে সব চেয়ে ভালো উপায় এবং এতে তাঁর মুখরক্ষাও হবে। কারণ, মুখে বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও তিনি কোন কথাই কাজে পরিণত করতে পারেননি।

ইংলণ্ডে—যেখানে বিচারটা প্রধানত রীতি ও পূর্বানুগামী—সেখানে যে প্রথা আছে তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উধমপুরের রাজ্যসরকার

কর্তৃক যে বিচারবিভাগীয় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা আছে—

'উধমপুরের মহারাজাধিরাজ, সূর্যবংশী গোষ্ঠীর বংশধর ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার নাইট-কমাণ্ডার (দ্বিতীয় শ্রেণী), ইত্যাদি, ইত্যাদি—আমরা স্যার গঙ্গা সিং, কচ্ছপটিকে এক বছরের জন্যে গঙ্গানদীতে নির্বাসনের আদেশ দিচ্ছি, আমাদের সন্দেহ কচ্ছপটি হয় একটি হাড়-শয়তান, নয়তো ভগবান বিষ্ণুর অবতার, সুতরাং এই নির্বাসনের ফলে কচ্ছপটি কোন একটি দৈব ও আশ্চর্য ঘটনার সাহায্যে আপন যথার্থ পরিচয় প্রমাণ করতে পারবে।' ইত্যাদি।

সেই বছর একজন ধোপা যখন পুকুরের ধারে কাপড় কাচছিল তখন একটি কচ্ছপ তার পাঁচটি আঙুল কামড়িয়ে নেয় এবং মহারাজার প্রিয় রাণীর গর্ভে ভগবানের সন্তান জন্মগ্রহণ করেন।

এই শেষোক্ত ঘটনা উপলক্ষে উৎসব করবার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী মহারাজা একদিন সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলেন। এবং প্রত্যেকেই বিশ্বাস করল যে ভগবান বিষ্ণু বুড়ো মহারাজার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছেন, উধমপুরে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত এবং উধমপুর আদর্শ রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

সীমান্ত

[এড্‌ওয়ার্ড জে. ও'ব্রায়েন-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে]

জনপ্রাণীহীন জোয়ারের ক্ষেত, তারই ধার দিয়ে স্ত্রীলোকটি এগিয়ে চলেছে তামাটে রঙের সোয়াৎ পাহাড়ের গলিত লাভার দিকে। ও দেখছে, জমির ওপর কোথাও গাধা বা ছাগলের পাল চলে যাবার চিহ্ন পাওয়া যায় কিনা। বিকেলের ঝাঁ ঝাঁ রোদে ও গাঁ থেকে বেরিয়েছে নাদি কুড়োবার জন্যে, এই নাদি ব্যবহৃত হবে জ্বালানি হিসেবে। মালভূমির উপরে মাটির তৈরি কুড়ে ঘরের ঘিঞ্জির মধ্যে ওর ভাঙা চালাঘর, মাটির উনুন—কিন্তু কাঠ পাওয়া যায় না, কাঠ বলতে কখনো কখনো কাঁটা জঙ্গলের দু-একটা ঝাড়, এই মাত্র। এদিক-ওদিক তাকিয়েও ও জন-প্রাণীর চিহ্নমাত্র দেখতে পেল না। ওর শ্যেন দৃষ্টি যতদূর চলে—শুধু ধূ ধূ মাঠ।

একটা উঁচু ঢিবির উপরে ও একবার দাঁড়াল। বাঁ হাতের উল্‌টনো তালু দিয়ে সূর্যের চোখ-ঝল্‌সানো আলো থেকে চোখ আড়াল করেছে, মাথার উপরের ঝুড়িটা ধরেছে ডান হাতে আর পাহাড়ের চূড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে কোথাও ঝোপঝাড়ের চিহ্ন আছে কিনা। ও ভালো করেই জানে যে রাখাল যতই সতর্ক হোক না কেন দু-একটা

ছাগল বা গাধা ঝোপঝাড়ে কামড় বসাবার জন্তে দল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবেই।

কিন্তু কোথাও একটা শুক্‌নো ঘাসেরও চিহ্ন নেই। যতদূর দৃষ্টি চলে উপত্যকার উপরে নীচু নীচু পাহাড়ের অপরিশেষ সারি, উদ্গত মধ্যাংশ নানা বর্ণে প্রকট—কোনটা রক্তবর্ণ, কোনটা বেগুনে, কোনটা সাদা। আর কুয়াশার মত একটা অস্পষ্টতা উষ্ণ চাপা নিশ্বাসের মত মাটি থেকে মসৃণ আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

আবার ও চলতে শুরু করল, পায়ের তলায় যেখানে যেখানে জুতোর ফুটোর ভিতর দিয়ে রোদে-পোড়া মাটির ছোঁয়া লাগছে সেই জায়গাগুলো জ্বলছে। সকাল বেলা কলের পাখি গাঁয়ের উপর যে কাগজ ছড়িয়েছিল সেই কাগজ জুড়ে জুড়ে ও ফুটোগুলো বন্ধ করেছিল, এখন চলতে চলতে কাগজ সরে গিয়ে ফুটোগুলো আবার বেরিয়ে পড়েছে।

'সে কথা দিয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসার সময় আমার জন্তে জুতো আনবে,' ক্ষোভ ও অভিমানের সঙ্গে ও আপন মনে বলতে লাগল: 'কিন্তু এখন সে নিজের কথায় নিজেই খেলাপ করেছে।' ব্যাপারটার এ ছাড়া অন্য অর্থ ছিল না তার কাছে। পেশোয়ার থেকে যে-সব লোক ফিরে এসেছে, তাদের কাছ থেকে তার মুখের কোন কথা বা তার সম্পর্কে কোন রকম খোঁজখবর ও পায়নি। শুধু একটা গুজব কানে এসেছে যে সীমান্ত-গান্ধী খান্ আবদুল গফ্‌ফর খানের বক্তৃতা শোনার জন্য আংরেজি সরকার তাকে কারারুদ্ধ করেছে।

মাথার উপরকার চুপড়ির ঠাণ্ডা ছায়া পড়েছে আর সেই সঙ্গে গরম হাওয়ার ঝাপটা লাগছে মুখের উপর—মুখটা হয়ে উঠেছে ডালিমের মত টক্‌টকে লাল। স্বস্তির ছোঁয়া লেগে হালকা লাগছে নিজেকে, বড় বড়

পা পড়ছে। এই স্মৃতি কতকগুলো বাক্য সমষ্টির চিন্তা নয়, জঠরের মধ্যে একটা অনুভূতি—স্নায়ুর একটা কম্পন।

সে যা করত তাতে লজ্জা সরমের বালাই থাকত না। 'আবদুল রহমানের মেয়ে করিমা, তোমার গাল দেখে ডালিম আর গোলাপেরও হিংসে হয় যে...' ওকে জ্বালাতন করবার জন্যে আর কিছুটা দুষ্টুমি বুদ্ধি থেকে বহু পুরানো লোকগীতির এই ধুয়োটুকু গাইত সে।

তারপর ওর প্রতিবাদ সত্ত্বেও দিন-রাত্রির বাচবিচার না করে যখন-তখন খেয়ালখুশিমত জড়িয়ে ধরত ওকে আর ওর গালদুটো ক্রমশ গরম হতে হতে শেষকালে মনে হত যেন পুড়ে গিয়ে ফেটে পড়বে।

আর এখন জঠরের মধ্যে একটা শূন্যতার যন্ত্রণা অনুভব করছে ও—ভোঁতা ও নিরবয়ব, ভোরে তৃষ্ণার মত। আর এখন অস্পষ্ট একটা স্মৃতি স্পন্দিত হচ্ছে মনের মধ্যে—যখন সে তাকে দু-হাতের মধ্যে পিষে ফেলত সেই সময়কার দুমড়নো-মুচড়নো জামা-পাৎলুনের খশ্‌খশানির স্মৃতি, সেই হঠাৎ-বিস্রস্তা হওয়ার চাপা অস্বস্তি, সেই স্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন যা নাকি কিছুক্ষণের মধ্যেই বিলীন হয়ে যেত আত্মতৃপ্তির অনির্বচনীয়তায়। এই স্মৃতি একটা দুর্বোধ্য প্রক্রিয়ায় ওকে আপ্লুত করে দিয়ে গেল লজ্জা-পেয়ে-রাঙিয়ে-ওঠার লজ্জায়, গভীর ও সম্পদশালী নিঃশব্দতায়। ঠিক এই জনহীন প্রান্তরেব নিঃশব্দতার মত। তফাৎ এইটুকু যে এখানকার নিঃশব্দতা মাঝে মাঝে কোথা-থেকে-ভেসে-আসা পতঙ্গদলের গুঞ্জনে আর গুবরে পোকার ডাকে চিরে যাচ্ছে। মাঠে ফসল কাটা বা হালচালানোর কাজেই হোক বা বাড়িতেই হোক—সর্বত্রই সে ছিল দুর্দান্ত।

সে যা বলত তাতে লজ্জাসরমের বালাই থাকত না। 'আবদুল রহমানের মেয়ে করিমা, যার গাল দেখে ডালিম আর গোলাপের হিংসে

হয়, সে বড় ছেনালি করে।' আর তারপর যখন ইস্‌মাৎ ওর গর্ভে, ওর পেটটা হাতের ছোঁয়ায় নরম, আর কাঁপা-কাঁপা উষ্ণ ছোট্ট একটি রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে যখন ও মসজিদের কুয়ো থেকে কয়েক বালতি ঠাণ্ডা জল নিজের গায়ে ঢেলে নিয়ে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় গা এলিয়ে দিত তখন ওর মনে হত যেন তার অজাত শিশু পেটের মধ্যে পা ছুঁড়ছে। শামুস্‌কে একথা বলতেই সে বলেছিল: 'আবদুল রহমানের মেয়ে করিমা, যার গাল দেখে ডালিম আর গোলাপের হিংসে হয়, তার ছেলে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে লাফাচ্ছে। এই ছেলেটি বদমায়েসি বুদ্ধিতে আর সাহসে তার বাপকেও যে ছাড়িয়ে যাবে, একথা হলফ্ করে বলতে পারি। দেখছ না, আমার তুলনায় এখন ও কতটুকু, পাকা ফলের মধ্যে ছোট্ট একটু বীজের মতো এখনও তোমার পেটের মধ্যে—কিন্তু এর মধ্যেই ও কী ভয়ানক চঞ্চল…' লোকটার বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল না।

চুপড়ির তলায় মাথাটা নুয়ে পড়েছিল, চোখ তুলে ও আবার পাহাড়-গুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। স্মৃতির প্রলুব্ধ রেখার রেখায় আপন সন্তানের চেহারা ফুটে উঠেছে…নরম, তুলতুলে আর তাজা… ক্ষুদ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাপের গন্ধ জড়ানো। ঠিক ওর চোখের মণির তলায় ফুটে রয়েছে যেন। আর চোখের সামনে রুক্ষ অনুর্বর মাটি ক্রুদ্ধ অগ্নিশিখায় জ্বলছে, ওর ঘরের মাটির উনুনে ছাইঢাকা অঙ্গারের মধ্যে জ্বলন্ত কয়লার মত। আশেপাশে জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। বুকের মধ্যে একটা অবরুদ্ধ ক্রোধ ও বিরক্তি গুমরে উঠছে, অনুভব করল ও।

আর কারণও আছে। এক বছর হতে চলল শামুস্ নেই, গত বছর তার চলে যাবার ঠিক আগে রমজানের রোজা শেষ হয়েছিল। তারপর

সরকার তাকে ধরে নিয়ে জেলে পুরেছে। কতদিন তাকে জেলে থাকতে হবে তাও ও জানে না।

যদি ও একবার জানতে পারে, একবার শুধু জানতে পারে যে সে মরেনি! গভীর আবেগের সঙ্গে বলল ও। বলল চারদিককার পাপাড়কে, নিঃশব্দতাকে, মাথার উপরকার আকাশকে। নিজেকেই নিজে ও বলল যে ও শুধু এইটুকুই জানতে চায়—সে এখনো বেঁচে আছে। এইটুকু জানলেই ও আংরেজি সরকারের জন্যে দিনরাত্রি পাথর ভাঙার কাজ করে যাবে, শ্বেতাঙ্গ মানুষগুলো ওয়াজিরিস্তানে যে পাথর নিয়ে যায় সেই পাথর ভাঙবে রাস্তায় বসে বসে।

আর তারপর নিজের ঘর্মাক্ত কপালের কোমল চামড়ার উপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে এবং ঘর্মাক্ত শরীরের চট্‌চটে ভাবটা দূর করবার জন্যে মুরগীর পালক ঝাড়ার মত পরনের শতছিন্ন রঙবেরঙের পোষাকটা একবার ঝেড়ে নিয়ে মনে মনে ভাবল, শামুস যদি শোনে যে খাওয়াপেরার জন্যে ওকে কাজ করতে হয়েছে এবং সাদা মানুষগুলোর জন্যে ও পাথর ভেঙেছে তাহলে সে নিশ্চয়ই খুশি হবে না। কারণ ও শুনেছে যে ঐ সাদা মানুগুলো এই রাস্তাটা তৈরি করছে পল্টন আনবার জন্যে, [illegible]তের সন্তান মানুষকে তারা গুলি করে মারবার জন্যে। কিন্তু ওর উপায় কি? ওকে নিজে বাঁচতে হবে, ছেলেকে বাঁচাতে হবে। পাহাড়ের দিকে যে জমির ফালিতে শামুস জোয়ার ও ভুট্টার চাষ করেছিল, সে-কাজ কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে করা শক্ত। আর আগের বছরের ফসল বসন্তের আগেই ফুরিয়ে গেছে, তারপর এই কাজ নিয়েছে ও। আর এই কাজেরও কোন স্থিরতা নেই। কারণ ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করলে সাদা মানুষগুলো এক আনা মজুরি দেয়, আর ভোর থেকে রাত্রি

পর্যন্ত কাজ করলে দেড় আনা। তাছাড়া, ও আর অন্য স্ত্রীলোকরা যারা এই কাজ করছে তাদের নামে গাঁয়ে বদনাম রটেছে, মোল্লা শাসাচ্ছে একঘরে করবে বলে। কিন্তু আল্লার কিরে ও জানে ওকে কোন পাপ স্পর্শ করেনি। এইতো সেদিন যখন পল্টনের একটা লোক ওর দিকে শিস দিয়েছিল আর ধূর্তের মত চোখ টিপেছিল, ও তো কাস্তে উঁচিয়ে ফুঁসে উঠেছে তার দিকে, আর লোকটা রাগে লাল হয়ে পালিয়ে গেছে তাড়াতাড়ি। সেই থেকে পল্টনের লোকগুলো ওকে বাঘিনী বলে এবং কখনো ওর কাছে ঘেঁষে না। 'ইসমাৎ-এর বাপ আমাকে যেমনটি রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে ঠিক তেমনটি দেখবে,' ও ভাবে: 'লোকে যাই বলুক না কেন, তার ছেলেকে আমি যে-ভাবে পারি খাওয়াব। বড় হলে এই ছেলেরও নিশ্চয়ই শামুসের মত গায়ের জোর হবে, বাপের মত তেমনি কালো চোখ তেমনি বাজপাখির মত চোখা নাক...এই তো আমি ঘরে নেই আর এতক্ষণে হয়ত ছেলেটা জেগে উঠেছে...কি যে সব আবোল-তাবোল ভাবছি...'

একটা পথেরের ধারে আরেকবার মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে একটা জলশূন্য গিরিনালার গভীর খাদের দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ও তাকিয়ে রইল। বালির কণাগুলো আগুনের ফুলকির মত চিক্‌চিক করছে, ঠিক যে ধরনের আগুনের ফুল্‌কি মাঝে মাঝে ওর হাতুড়ির ঘায়ে পাথর থেকে ছিট্‌কে আসে। ওর মনে পড়ে, এখানে কোথায় যেন একটা ছোট জলাশয় আছে, সেখানে গরুছাগল জল খাবার জন্যে আসে। যে পাথরটার উপর ও দাঁড়িয়েছিল সেটা কামারশালার জলন্ত লোহার মত তেতে উঠেছে। পা-টা একটু সরিয়ে নিয়ে ও অধৈর্যের সঙ্গে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। সামনে যে সাদাটে ও ধূসর পাথরের চাঁই

দেখা যাচ্ছে ওটার পিছনেই বোধ হয় সেই জলাশয়। নালাটার ভিতরে নেমে ও দেখবে কোথাও শুকনো গোবর পড়ে আছে কি না। নালাটার একপাশে চেরীগাছের একটা ঝোপও আছে আর ছাগলগুলো তো—'আরে, আল্লার দয়াই বলতে হবে, ওই পাথরটার ছায়ায় দেখছি অনেক নাদি পড়ে আছে, পুরো এক পাল জন্তু না হলে এত হয় না।'

যে খাড়া পাথরটার উপর ও দাঁড়িয়েছিল তার ধার দিয়ে লাফিয়ে নীচে নামল, ফলকের মত ধারালো আরেকটা পাথরের উপরে কোনমতে পা রেখে দাঁড়াল ও।

ফলকটার নীচে মাটির ফাটলে অনেকগুলো গর্ত। দেখে ওর একটু ভয় হল কারণ এই পাহাড়ের ফাটাফুটোয় সাধারণত সাপের বাসা থাকে।

এক পা নীচে নামল ও, তারপর নেহাতই যেন একটা কৌতূহলের আগ্রহাতিশয্যে থেমে গিয়ে মাথা নীচু করে তাকাল একটা গর্তের ভিতরে এবং বাঁ পা-টা ভিতরে ঢুকিয়ে গর্তের ভিতরটা পরখ করতে লাগল।

একটা তীক্ষ্ণ ঘড়ঘড় আওয়াজ।

আর সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণ গিরিপথ ধরে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উর্ধ্বশ্বাসে নীচের দিকে ছুটতে শুরু করেছে ও—যদিও ও নিশ্চিতভাবেই জানে যে যে-গর্তটার ভিতরে ও পা ঢুকিয়েছিল সেই গর্তের ভিতর থেকে শব্দটা আসেনি। নীচে নেমে দাঁড়িয়েও শরীরের থরথরানি গেল না, পা-দুটো অনিচ্ছাসত্বেও কাঁপছে। ঘুমিয়ে-ওঠা দৃষ্টির সামনে সব কিছু মুহূর্তের জন্যে ঝলসে উঠেছে মনে হল। হৃদপিণ্ডের ধুকধুকুনি বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা মারছে—এ ছাড়া আর কিছু ও শুনতে পাচ্ছে না।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে একবার পিছন দিকে না তাকিয়ে ও থাকতে পারল না। যদিও শরীরের ভারে পা কাঁপছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলার ভিতরটা দলা পাকিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে যেন—তবু ও একবার দেখতে চায় শব্দটা বুনো বেড়ালের না সাপের ?

ঘড়ঘড় আওয়াজটা এবার একটানা গুঞ্জনের মত শোনা গেল। ফাটলের গর্ত বা নালা থেকে নয়, শব্দটা আসছে উপরে আকাশের কোন একটা দিক থেকে।

বুকে সাহস ও শরীরে শক্তি সংগ্রহ করে ও মাথা তুলল, যে পাথরের চাঁই থেকে ও নীচে নেমে এসেছিল তার উপরে লাফিয়ে উঠল আবার। পাথরের মসৃণ গা থেকে পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল প্রায, শরীরটা কাঁপছে ঝড়ের সময়ে গাছের পাতার মত, বুকেব স্পন্দন বন্ধ হবার মত অবস্থা। তারপরে কোন রকমে দু-হাতে আঁকড়িযে ধরে পাথরটার উপব উঠে দাঁড়াল।

মসৃণ আকাশের স্বচ্ছ অস্পষ্টতায় সূর্যের আলো চিম্‌নি থেকে বেরিয়ে-আসা ধোঁয়ার মত কাঁপছে। সেই পটভূমিকায় দেখা গেল এক ঝাঁক কলের পাখি দুর্ভিক্ষের বার্তাবাহী অমঙ্গলসূচক সাদা ঈগলের মত ঘুরপাক খেতে খেতে উপত্যকার উপর পাত্রবোঝাই নিরেট নাদি ছড়াচ্ছে।

নিশ্বাস ফেলবারও সময় হল না, দীন্ গুল কামারের বাড়ির কাছে মালভূমির ধারে একটা পাত্র পরেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে গেল। মেঘের মত ধুলো উঠল আকাশের দিকে।

যন্ত্রগুলোর সশব্দ ঘড়ঘড়ানিকে এবার মনে হচ্ছে একটা বিরতিহীন বজ্রের প্রতিশব্দায়মান আলোড়নের মত, আকাশ চিরে এমন তীব্র বিদ্যুত—যেন কোরাণে বর্ণিত শেষ বিচারের দিন এসে গেছে।

প্রচণ্ড একটা আওয়াজ তুলে আরেকটা শাস্ত্র এসে পড়েছে…একশোটা মাটির কলসি একসঙ্গে ভেঙে পড়ার চেয়েও জোরে আওয়াজ। রিক্ত মাটির গা থেকে খসে খসে চাপ চাপ মাটি ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বাঁধ-ভাঙা ঝরণার চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে-আসা স্রোতের শীকরসিঞ্চনের মত। তারপর আরও একটা, আরও, আরও…

কলের পাখির ধ্বংসলীলার ভয়াবহতা বিস্ফারিত চোখের সামনে ও পিছনে অত্যন্ত স্পষ্ট ও তীব্রভাবে ভয়াল অগ্নিশিখার মত মূর্ত হয়ে উঠেছে।

'আমার ছেলে, আমার ছেলে!' ও চিৎকার করতে লাগল, গলার ভিতর থেকে স্বর যেন আর বের হয় না। তারপর ও ছুটল গাঁয়ের দিকে।

কলের পাখিগুলো সংখ্যায় আরও বেড়েছে এবং একটা একঘেয়ে ধাতব গুঞ্জন তুলে এবার দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ওঠানামা করছে—যেন চেরা আকাশ ও উৎক্ষিপ্ত মাটির নরকে শয়তানের অনুচর দল। উপাদান বিদীর্ণ হওয়া সম্পর্কে যেমনটি ঘটবে বলে পয়গম্বর ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ঠিক তেমনি একটানা দীর্ঘ যন্ত্রণায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড আচ্ছন্ন হয়েছে মনে হয়। কানে তালা লাগানো আওয়াজ আর ঘুলিয়ে-ওঠা দৃষ্টির সামনে ধুলোর মেঘ, কিন্তু এখনো ও পায়ের তলায় মাটি অনুভব করতে পারছে।

একবারও না থেমে ছুটছে ও, শেষকালে প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ওর টাটিয়ে-ওঠা কোমরে অসহ্য একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। খানা-খন্দর পার হচ্ছে লাফিয়ে, ছোট-বড় পাথরের রুক্ষ বিস্তৃতিকে টপকিয়ে যাচ্ছে। মাটির কুঁড়েঘরগুলো আরও একশো গজ দূরে কিন্তু এই

একশো গজ পথটুকু ওর দৃষ্টি থেকে যেন মুছে গেছে। কিন্তু ওর শরীর যদি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়েও যায় তবুও ওকে সেখানে পৌঁছতে হবে, শরীরের হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলেও যেতে হবে সেখানে। বাকি পথটুকু যদি ও এক লাফে চলে যেতে পারত! একটা ছোট পাহাড় থেকে গড়াতে গড়াতে যদি এই দূরত্বটুকু পার হয়ে যাওয়া যেত! —আর কিছু ও চায় না! শুধু একবার, একটিবারের জন্যে···

পা দুটো আর টানছে না, চলার গতি কমিয়ে ও চেষ্টা করল পায়ে দৃঢ়তা নিয়ে আসতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরেকবার সেই থলে-ভর্তি মাটির কলসি ভাঙার আওয়াজে ওর হৃদপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গেল, মাটির বীভৎস কম্পনে চলার গতি গেল রুদ্ধ হয়ে। আর তারপর চোখের সামনে যখন দেখল কুয়োর মত গভীর এক ফাটল, তখন একেবারে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটু পরে লাফিয়ে একপাশে সরে এসে কম্পমান শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে ছুটে চলল প্রচণ্ডভাবে। ছুটতে ছুটতে বিলাপ ও দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে শুধু বলতে লাগল : 'হায় রে হায়! আমার ছেলে! আমার ছেলে!' আর যতই ও ছুটছে ততই ওর জঠরের গহ্বর থেকে আশার তলটুকু তলিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ওর প্রত্যয় ফিরে এল, দম নেবার জন্যে দাঁড়াল একটু। কিন্তু ভয়ংকর রকমের আওয়াজ তুলে তুলে মাটি চির খাচ্ছে। ও চোখ তুলে উড়োজাহাজগুলোর দিকে তাকায় : ওর ভয়ার্ত চোখে করুণ কাকুতি আর একটা সংকীর্ণ ইচ্ছা—যেন ওর নিজের আর ওর ছেলের কোন ক্ষতি না হয়।

কিন্তু এবার ও দেখতে পেল, চোখের সামনে মাটির কুঁড়েঘরগুলো জ্বলছে, আর ধিকি ধিকি পুড়ছে। বাইরের সীমানার দিকে জায়গায়

জায়গায় কুঁড়েঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মেয়ে ও পুরুষরা ভীত-চকিত হয়ে আতঙ্কে ছুটোছুটি করছে, একজনের গায়ে অপরজন ধাক্কা খাচ্ছে, পড়ে যাচ্ছে, ক্রন্দনরত ছেলেমেয়েগুলোকে পিছন পিছন টেনে আনছে, বড় বড় পাথর ও শিলার পিছনে আশ্রয় খুঁজছে···

কলের পাখিগুলো গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে আবার গাঁয়ের উপর এসেছে, সীসার পাত্রের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে উর্ধ্বোত্থিত ধোঁয়ার মেঘ। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার ও থামল, এমন একটা ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল উড়োজাহাজগুলোর দিকে যে মুখের তেতো আস্বাদটা মথিত হয়ে সাদা ফেনা বেরিয়ে এল। দুরন্ত একটা প্রতিশোধের ভঙ্গিতে মুষ্টিবদ্ধ হাতদুটো তুলল উপরের দিকে এবং তারপর ওর এই ঘৃণার আঘাতে উড়োজাহাজগুলো ধ্বংস হয়ে যায় কি না দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল। কিন্তু কলের পাখিগুলো তেমনি ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে উপত্যকার এক দিক থেকে আরেক দিকে ছুটোছুটি করে চলেছে, বোমার পর বোমা বর্ষণ করছে তেমনিভাবেই। অর্ধেক কান্না আর অর্ধেক আর্ত চিৎকারের মত একটা বিলাপে ও ভেঙে পড়ল এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সামনের দিকে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করতে লাগল: 'আমার ছেলে। হায় রে, আমার ছেলে! আমার ছেলেকে বাঁচাও!'

'ইস্‌মাৎ-এর মা, থামো, থামো,!' মোল্লার ভাই আবদুল মজিদ চিৎকার করে বলল। কুমোরের চাকির আড়ালে লুকিয়ে থেকে সে কলের পাখিগুলোকে লক্ষ্য করে গাদা-বন্দুক ছুঁড়ছিল।

কিন্তু ও ছুটে চলল। যেন হঠাৎ একটা অন্ধকার এসে ওর চোখের দৃষ্টিকে আড়াল করে দেবে এমনি একটা ভয় ওকে পেয়ে বসেছে।

'কোথাকার বোকা মেয়ে, থামোনা।' ওকে আটকাবার জন্তে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে মজিদ বলল।

শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মজিদের দৃঢ়নিবদ্ধ পেশল হাতটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে করতে ও চিৎকার করে উঠল, 'আমার ছেলে! আমাকে যেতে দাও! যেতে দাও আমাকে, আমার ছেলেকে নিয়ে আসি!' তীক্ষ্ণ একটা বিলাপের মত ওর গলার স্বর, নিরশ্রু কান্না।

'তোমার মাথা খারাপ নাকি? দেখতে পাচ্ছ না সারা গাঁয়ে আগুন লেগেছে। শয়তানের বাচ্চারা গাঁ উড়িয়ে দিয়ে গেছে!' চিৎকার করে বলল মজিদ।

'আমাকে যেতে দাও, আমাকে যেতে দাও!' আর্ত স্বরে ও বলল, তারপর দাঁত দিয়ে কামড়ে দিল হাতটা।

বিছায় কামড়ালে যেমন হয় তেমনি ভাবে হাতটা সরিয়ে নিয়ে নিষ্ফল আক্রোশে দাঁড়িয়ে রইল সে, শরীরের মাংসপেশিতে যেন আর উদ্যম নেই, চোখের রক্ত জমাট বেঁধে গেছে।

'হায় আল্লা', চিৎকার করে উঠল সে 'যে-সব সাঁচ্চা আদমি পরের গোলামী করে না তারা সবাই মরে যাবে নাকি।'

আবদুল মজিদের পাশ কাটিয়ে ছিটকে বেরিয়ে ও দাঁড়িয়েছে নালাটার পাশে, আবর্জনার স্তূপ ধিকি ধিকি জ্বলছে, মাটির তৈরি কুঁড়েগুলোর দেওয়াল ধ্বসে পড়েছে আর সেই ধ্বংসস্তূপের উপর জ্বলন্ত কড়িবরগায় সামনের পথ রুদ্ধ।

লাফিয়ে আগুন পার হতে হবে এই ভয়ে একটি সংক্ষিপ্ততম মুহূর্তের জন্তে ও দাঁড়িয়ে রইল, তারপরে দাঁতে দাঁত চেপে, চোখ বুজে, বিস্‌মিল্লা

ঝাওড়াতে ঝাওড়াতে লকলকে শিখায় ভিতর দিয়ে ছুটে গেল গুলির মত।

আগুনটা পেরিয়েই একটা উঁচু মাটির ঢিবি, ধাক্কা খেয়ে প্রায় পড়ে যেতে যেতে ও টাল সামলিয়ে নিল, তারপর জামাকাপড সামলিয়ে মূর্চ্ছাগ্রস্তের মত গোঙাতে গোঙাতে ছুটতে লাগল।

সামনের মসজিদের প্রাঙ্গণে একটা বোমা ফাটল। ভীতিপ্রদ হিংস্রতায় এলোপাথারি আগুনের ঢেউ বযে গেল জায়গায় জাযগায। দেবদূত গ্যাব্রিযেল তাঁর ধ্বংসকার্য শেষ করার পব সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেমন মহাপ্রলয় শুরু হয়েছিল তেমনি এক মহাপ্রলয়ের মধ্যে আকাশের জ্যোতিষ্কপুঞ্জ যেন পৃথিবীব উপর হুমড়ি খেয়ে পডেছে।

আগুন-জ্বালানো, ঝল্সানো ও দম-আটকানো উত্তাপের মধ্যেও ওর পা-দুটো কিন্তু তখনো মাটি থেকে টলেনি। ধ্বসে-পড়া দেওয়ালের নগ্ন স্তূপ থেকে স্তূপে হোঁচট খেতে খেতে ও দেখতে চেষ্টা করছে ওর ছেলে কি-ভাবে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পডে থাকবে। ভাঙা বাড়িগুলোর ঝল্সানো এবড়োখেবড়ো ধাবগুলো দেখে স্পষ্টই মনে হচ্ছিল যে ওর ছেলেও এই আবর্জনাব স্তূপের মধ্যে চাপা পড়েছে। কথাটা ভাবতেই নিজের অনিচ্ছাসত্বেও ও একটা মর্মভেদী চিৎকার করে উঠল—যেন নিজের ছেলের মৃতদেহ ও দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু মসজিদের চূড়াটা এখনো অক্ষতভাবে দাঁড়িয়ে, নিজের এই ভীতিকর কল্পনাকে ওর নিজেরই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল না। এমনও হতে পারে ওর কুঁড়েঘরের ছাদটা বেঁচে গেছে এবং ওর ছেলে এখনো জীবিত...ভয়ে চাৎকার করে কাঁদছে। ঐই তো, ওই সরু গলিপথটুকু পার হলেই · ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে তবে পীরের দরগায ও সিন্নি দেবে।

যাই হোক, ও দেখতে পেল যে ওর কুঁড়েঘরের ছাদে আগুন ধরেছে, একটা দেওয়াল খসে গিয়ে হেলে পড়েছে, বাঁশগুলো ফাটছে চট্ চট্ শব্দে।

চারিদিকে তাকাতে গিয়ে ও একটু ইতস্তত করল—ভয়ার্ত শরীর ও মনের হতাশাকে কাটিয়ে উঠে আপন ইচ্ছাশক্তির নির্ভীকতাকে জাগিয়ে তুলছে ও। তারপর ও ছুটে গেল উঠোনের মধ্যে, পোড়া কাপড়ের গন্ধে দম আটকে আসছে, ধোঁয়ায় চোখ অন্ধ। দরজাটা খুলবার জন্যে ও সামনের দিকে হাতড়াতে লাগল, রাশি রাশি ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে মাথা গুঁজে ও ঢুকলো চালাঘরটার মধ্যে··· হাতড়াতে হাতড়াতে বাচ্চার দিকে এগিয়ে গেল।

যে খাটিয়ার উপর ছেলেটা শুয়েছিল সেটা পুড়ছে। কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটা লাল হয়ে গেছে, কোন কিছু একটা আঁকড়ে ধরবার শেষ চেষ্টায় হাতের মুঠি আকাশের দিকে তোলা।

'আমার ছেলে রে, আমার ছেলে!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে হাত দুটো উন্মত্তভাবে সঞ্চালিত করে ও উপুড় হয়ে পড়ল ছেলেটার উপর। ওর হাতের এই সঞ্চালন দুই কারণেই—ছেলের জন্যে ভালোবাসা আর আগুন যদি ওর ছেলের শরীরের কোন অংশ পুড়িয়ে দিয়ে থাকে তবে সেই আগুনকে চেপে নিবিয়ে দেওয়া।

তারপর ছেলেটাকে তুলে নিয়ে ও ফিরে চলল। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, শরীরের অধ্যাংশ পিছন দিকে বাঁকানো।

কুঁড়েঘরের খড়ের ছাদ পড়ে গিয়ে দরজা দিয়ে বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

মেঝের উপর একটা জলের ঘড়া ছিল, সেটা তুলে নিয়ে ও পড়ে-যাওয়া ছাদের ধ্বংসস্তূপের দিকে ছুঁড়ে দিল। জলের ঘড়াটা পড়ে গিয়ে আগুনের শিখাকে একটু উস্‌কে দেওয়া ছাড়া ছোট্ট একটু অনাবৃত অংশের আগুনকে নিবোতে পারল শুধু, কল কল শব্দে জল গড়াতে লাগল।

ফাটল-ধরা দেওয়ালের ফুটো দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে আসা ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না।

ক্রন্দনরত ছেলেটার মাংসপিণ্ডকে বুকের কাছে চেপে ধরে ও বলল, 'খোকা আমার কেঁদো না, কেঁদো না লক্ষ্মীটি।' এমনভাবে বলল যেন কথাগুলো বাচ্চা শুনবে। আর তারপর আঁচল দিয়ে বাচ্চাটাকে ঢেকে সামনের দিকে ছুটে গেল।

ওর পা-টা গিয়ে পড়ল কাঠের খুঁটির জ্বলন্ত লাল অঙ্গারে, আর ও আর্ত চিৎকার করে উঠল। কিন্তু ইতিমধ্যেই ও দেওয়ালের ফুটোটা দিয়ে অপর পারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, কোলের শিশুর গায়ে কোন আঁচড় লাগেনি। কেমন এলোমেলো পা পড়ছে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে, মুখটা ফ্যাকাশে, তারপরেই আবার বাচ্চাটাকে বুকের উপর গভীরভাবে চেপে ধরে দুর্বল ভঙ্গিতে হাসল—যেন নিজের মধ্যে ও ছেলের মধ্যে সাহস সঞ্চার করতে চাইছে। তারপর আবার ও উঠোনের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। কিন্তু আঁচলটায় আগুন ধরে গেছে ও বুঝতে পারছে। নীচু হয়ে আঁচলটা ছিঁড়ে ফেলল ও। আঁচল ছিঁড়তে গিয়ে হাত পুড়ে গেল আর ছেঁড়া আঁচলটা ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে জামায় আগুন ধরে গেল। হাত দিয়ে চাপড়ে চাপড়ে আগুনটা নিবিয়ে ফেলে আবার সে সরু গলিটা দিয়ে ছুটে চলল।

[illegible]গুলো চট চট শব্দে ফাটছে ও পুড়ে যাচ্ছে। গলির মধ্যে জঞ্জাল আবর্জনার স্তূপ, আগুনের শিখা লক্‌লক্ করে আকাশের দিকে উঠেছে : আগুনের শিখা থেকে উল্কার মত এক একটা চক্‌চকে টুকরো খসে গিয়ে কিছুটা দূর যেতে না যেতেই আবার নিবে যাচ্ছে।

পিছন ফিরে ও মসজিদের দিকে তাকাল। দেখল মসজিদের গা ঘেঁষে যে সরু গলিটা বেরিয়েছে সেখান দিয়ে পালানো যায় কি না। কিন্তু ইতিমধ্যে মসজিদের চূড়াটা উঠোনের উপর ভেঙে পড়েছে এবং খুব সম্ভবত ওই পথও সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ।

'আবদুল মজিদ, আবদুল মজিদ!' ঘেরাটোপের মধ্যে ঘূরপাক খেতে খেতে ও চিৎকার করতে লাগল : 'কোথায় তুমি, আমার ছেলেকে বাঁচাও!'

কিন্তু এই নরককুণ্ডের মাঝখানে বিভিন্ন শব্দ ও আগুনের ফোঁস-ফোঁসানির মধ্যে ওর ক্ষীণ স্বরের ডাকে কোন জবাব এল না; শুধু আশেপাশের বাড়ি থেকে মানুষেব আর্ত চিৎকার, মাথার উপরে যে দৈত্যগুলো হুংকার দিয়ে ফিরছে তাদের নাগাল পাবার চেষ্টায় আগুনের শিখার আড়াআড়ি। এই দুর্ভাগা শহরের যেখানে যত পাপকাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে তারই প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আল্লা যেন এই দৈত্যগুলোর বাঁধন খুলে দিয়েছেন।

তীক্ষ্ণ চিৎকার করে গোঙাতে গোঙাতে ও ছেলেটাকে বুকের উপর চেপে ধরল এবং যে গলিটা দিয়ে ও ভিতরে ঢুকেছিল সেই দিকে ছুটে গেল। ওর ধারণা ওখানে ধ্বংসস্তূপের উপর যে একটিমাত্র কড়িকাঠ পুড়ছে সেটা ও লাফিয়ে পার হয়ে যাবে।

কিন্তু যখন ও গলির গজ দশেকের মধ্যে, তখন ও দেখল যে একটা

বাড়ির গোটা ছাদটাই গলিটার মুখে ভেঙে পড়েছে এবং উঁচু উঁচু মাটির ঢিবির তলার খড়কুটোগুলো লক্ লক্ করে জ্বলছে।

মাথা চাপড়াতে চাপড়াতে ও চিৎকার করতে লাগল: 'হায় আল্লা, কোথায় তুমি? হায় আল্লা, তুমি কি আমার চিৎকার শুনতে পাও না? হায় পয়গম্বর খোদা, আমাকে পথ দেখাও। হায় শামুস!' মূর্ছাগ্রস্তের মত চিৎকার করতে করতে ও অস্থির হয়ে উঠল, ওর একটি কথাও শোনা যাচ্ছিল না, ওর একটি কথাও কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। আর তারপর ও সোজা হয়ে দাঁড়াল, আগুনের যে ভয়াল ও দুর্ভেদ্য পর্দা ওর পথ আড়াল করেছে তা ধাঁধিয়ে দিয়েছে ওকে, সর্বতোসঞ্চারী ভয়ংকর উত্তাপের জ্বালায় শরীর টন্ টন্ করছে ওর, তীব্র গন্ধযুক্ত রাশি রাশি ধোঁয়া নাকে ঢুকে ওকে দুর্বল করেছে, মাথা ঘুরছে ওর। নীচু হয়ে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ও দেখল যে ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

আগুনের বেড়াজাল ডিঙিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ও লাফ দিল, চোখের জ্যোতির ক্ষীণ আলোকে ওর মন ইচ্ছার তীক্ষ্ণাগ্র ভঙ্গুর অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ছে। হাত থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ছেলেটা গিয়ে পড়ল খড়ের ছাদের ভিতরে, আগুনের মাঝখানে। যে গোঙানি শোনা গেল তা এমন এক হৃদপিণ্ডের জ্বালা থেকে যা পুড়বে না, কান্নার সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে এল এমন এক চোখ থেকে যা কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে কিন্তু বুজবে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে এমন এক কান্না যা দম আটকে দেয় না···। 'আমার ছেলে, আমার ছেলে, আমার ছেলে রে!' বিপদমুক্ত অঞ্চলে দাঁড়িয়ে নিজের শিশুকে পুড়তে দেখতে দেখতে ও অসহায়ভাবে কাঁদতে লাগল। তারপর মাটিতে আছড়ে পড়ে মুষ্টিবদ্ধ

হাত একবার কপালে চাপড়ে আর একবার আকাশের কলের-পাখিগুলোর দিকে উঁচিয়ে চিৎকার করতে লাগল : 'এব্‌লিস্‌-এর বাচ্চা ! শয়তান !'

এবলিসের বাচ্চাগুলোকে মনে হচ্ছে পশ্চিম দিগন্তের গায়ে অনড়, আকাশে তাণ্ডবনৃত্যের পর এখন তারা অনেক দূরে, নাগালের বাইরে, যেন নীচের জগতের পাতালপুরীতে যে অগ্নিকাণ্ড হত্যালীলা ও ধ্বংসকার্য তারা শুরু করে এসেছে তাই এখন পরম সন্তোষের সঙ্গে লক্ষ্য করছে।

ডিউটি

ভারতে গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্নের সূর্য সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। মাটি তেতে ওঠে, মাটির উপরের স্তর ফেটে চৌচির হয়ে যায়। খানা-ডোবা, হ্রদ-পুষ্করিণীর জল ফুটতে থাকে আর বাষ্প হয়ে উড়ে যায়; কোথাও জল থাকে না। পশু-পাখি-ফুল শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়, শরীরের মধ্যে লঙ্কার মত জ্বলুনি ওঠে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়, হাঁফ ধরে, জিব বেরিয়ে আসে। তখন একমাত্র কাজ, কোন একটা ছায়াঘেরা জায়গা খুঁজে বার করা। বা কোন একটা আশ্রয়—তা যতই নড়বড়ে হোক্।

বাদল গাঁ থেকে শাখা রাস্তাটা এসে যেখানে চেৎপুরের ম্যাল্ রোডে মিশেছে, সেইখানে চৌকিদার মংগল সিংএর ডিউটি। ভোর থেকে শুরু করে এতক্ষণ পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা সময় রোদে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে এবার সে আশ্রয় নিয়েছে একটা কিকার গাছের তলায়; রাস্তার সাদা ধুলো পেরিয়ে এই গাছটা, ডালপাতা বিশেষ নেই। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রহমৎ-উল্লা সেপাই এসে তাকে ছুটি দেবে,—ব্যারাকে ফিরে যাবার আগে একটু জিরিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হতে পারলে মন্দ কি!

রাস্তার ধারের গাছগুলোর পাতার ভিতর দিয়ে পর্যন্ত রোদ এসে পড়ছে, আর স্যাঁৎসেঁতে গুমোট আবহাওয়ায় কোথাও আরাম নেই।

তবুও খোলা জায়গায় তালু-ফাটা রোদে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর এই অপেক্ষাকৃত ছায়াটুকুই মংগল সিংএর কাছে আশীর্বাদের মত মনে হল।

অবশ্য সে নিশ্চয়ই ধনী কারবারী ননীর দুলাল লালাদের মত নয়—যারা সূর্য ওঠার সময়ে গাড়ি চেপে ভোর-ভোর বাগানে বেড়াতে আসে টাটকা বাতাস 'খাবার জন্যে', আর তারপর সেই যে ঘরে ঢোকে, সূর্যাস্তের আগে আর তাদের দেখা যায় না। সারা দিন এদের কাটে বৌয়ের কোলে মাথা রেখে দুধ-জল গিলে বা ইলেকট্রিক পাখার ঠাণ্ডা বাতাসে দোকানের সামনের পাটাতনের উপর তালগোল পাকিয়ে শুয়ে।… না, না, এদের মত সে কখনো বলে না 'এক পয়সার নুন সওদা করতে যাব, পাল্‌কির যোগাড় রাখ হে।' বা, এদের মত 'শিশিরবিন্দু পানে তৃষ্ণা নিবারণ' অবস্থাও তার নয়। শক্ত-সমর্থ চাষাভুষোর ঘর থেকে এসেছে বলে সে গর্বিত, চৌকিদারির জবরদস্ত কাজেও তার শরীরে টালটোক্কর পড়ে না। সত্যি কথা বলতে কি, চৌকিদারির কাজটা তার পক্ষে যথেষ্ট জবরদস্ত নয়, সে সত্যিকারের সিপাই হতে পারেনি বলে তার মনে একটা দুঃখ আছে। কারণ, পল্টনে মাইনে ও সাজপোষাক আরো ভাল, মুফৎ কুর্তা, মুফৎ খানা-পিনা। অবশ্য এ কথাটা সে শুনেছে পুলিসের কাজে যোগ দিয়ে কাগজে টিপসই দেবার পর। আর, একবার টিপসই দিলে তার আর নড়চড় নেই। গুরুর দয়াই বলতে হবে, পল্টনে তো আর উপরি পয়সা আয়ের কোন পথ নেই, কিন্তু এখানে পনের টাকা মাইনে ছাড়াও উপরি পয়সা আছে—আর তা থাকবে যতদিন পর্যন্ত ভাণ্ডারীরা দুধের সঙ্গে জল মেশাবে, বেশ্যাপল্লীতে দু-একটা খুন-খারাবি হবে, আর যতদিন থাকবেন ইমানদার লালারা, যাঁরা নিজেদের

নাম পুলিসের খাতায় ওঠার চেয়ে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করাটা বেশী পছন্দ করেন… •

এমন কি এখানেও, এই জনপ্রাণীহীন জায়গায় ডিউটি করতে নিয়েও—'যা তোমার নিজের তা তো আছেই, যা অপরের তার মালিকও তুমি।' কারণ চাষীরা যদি শুল্ক-ঘরের মুনশিকে নজরানা হিসেবে ফসল-মাখন-চিনি দিতে পারে তবে পুলিসকে দেবে না কেন? শুল্ক-ঘরের ঐ চিমশে চেহারার বাবুর তো আর এমন ক্ষমতা নেই যে বাজারের চোববাটপাড়ের লুটপাট বন্ধ করতে পারে?…সব জানে সে। প্রথমে বিগ্নে, তারপর ডাণ্ডা। যদি সে তহসিলদারকে কিছু ভেট দিতে পারত তবে কি তার জমি আজ শেঠ ঝিন্দরামের কবলে যায়?…যাই হোক, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন। মানুষেব কাজে অনেক গলতি। একথা তো ঠিক যে সে যদি জমিদারের পা জড়িয়ে না ধরত তবে তিনি কিছুতেই তাকে পুলিসের কাজের জন্যে অনুমোদন করে চিঠি লিখতেন না। সরকারের কাজে অনেক কিছু শেখা যায়। আর চাকরির চেয়ে আরামের কিছু আছে নাকি? ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, তাছাড়া ইজ্জৎ কত! তুমি যদি চাষী হও তাহলে শহরের এই ভীতু লোকগুলো পর্যন্ত তোমাকে টিটকিরি দেবে কিন্তু একবার ডাণ্ডা ঘোরালে তারা সেলাম ঠোকে। গেঁয়ো জংলীগুলো এমনিতে আইনকানুন মেনে চলতে পারে না, জানে না কোথায় কি করতে হয়—কিন্তু ডাণ্ডার জোরে তাদের দিয়ে সব করিয়ে নেওয়া যায়। ডাণ্ডার জোর না খাটলে হাতকড়ার ভয়! এমন কি বরকৎ আলির মত ডাকসাইটে ডাকাতও পার পায়নি। পার পাবে কি করে? একবার বাঁশিতে ফুঁ দিলেই যেখানে যত পুলিস আছে ছুটে আসে। হ্যাঁ, ক্ষমতা আছে

বটে সরকারের! আলমগিরের মত এই সরকারও স্তায় বিচার করবেনই, তাতে যদি উনুনের আগুন আর পাত্রের জল নিয়ে টান পড়ে তবুও...

নিজের ধুলো-লাগা পায়ের দিকে তাকাল সে, শক্ত গরুর চামড়ার তৈরি পুলিসী জুতো পায়ে। এতক্ষণ সে নিজেই নিজেকে তারিফ্ করে মনে মনে ভাবছিল যে সে পুলিস বাহিনীর লোক, যাদের সবাই সমীহ করে চলে। কিন্তু তবুও জুতোর দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, পল্টনে গেলেই ভাল হত। পল্টনের সেপাইরা বুট জুতো পায়। আর তার পায়ের পট্টিদুটো পর্যন্ত কেমন যেন ম্যাড়মেড়ে, খাকি সাজপোষাক ও কালো বেল্ট্ কেমন যেন ঢিলেঢালা। পল্টনের সাজপোষাক মজবুত আঁটোসাঁটো। তবে হ্যাঁ, তার বাঁশি ঝোলাবার চেন ও হাতের লাঠি দেখবার মত জিনিস, মাথার লাল-নীল পাগড়িও সুন্দর, তবুও—। হাতটা উপরের দিকে তুলে সে পাগড়ির ভাঁজ ঠিক করতে করতে পাগড়িটা মাথার উপর ঠিক ভাবে বসিয়ে নিল। ঝাঁ ঝাঁ রোদে উত্তপ্ত তালু, মাথায় বড় বড় চুলের বোঝা, ঘামে ভেজা পাগড়িটা ভারী হয়ে মাথার উপর চেপে বসেছিল।

আকাশ থেকে আগুনের ঢল নামছে। গাঢ় বাদামী রঙের ঝোপঝাড়, ঘাসের মুড়ি ও কাঁটাগাছে ঢাকা জনশূন্য মাঠগুলি যেন কাঠকয়লার মত চট্‌চট্ শব্দে ফাটতে শুরু করেছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। একটা তিতির কোথায় তার বাসা থেকে অস্ফুট শব্দ করে উঠল, মাথার উপর গাছ থেকে শোনা গেল ঘুঘুর ডাক। এই শব্দের আমেজ এমন একটা গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে যা বাতাসকে ভরিয়ে তোলে দীর্ঘ ও বিরতিহীন নিস্তব্ধতায়, জনশূন্যতার ও নিঃসঙ্গতার প্রশান্তিতে।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে কয়েক পা সরে এসে কিকার গাছটার ছায়া যেখানে সব চেয়ে ঘন সেখানে এসে দাঁড়াল মংগল সিং। হাতের লাঠিটার মুণ্ডির উপরে দু-হাতের ভর রেখে চিবুকটা রাখল মুঠোকরা হাতদুটোর আঙুলের উপরে। তারপর আধবোজা চোখে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল আর ভাবতে লাগল। কুকুর যেমন সামনের দুই থাবার উপরে চিবুক রেখে শিকারের জন্যে অপেক্ষা করে তেমনি।

চোখের সামনে দিয়ে রোদ-ঝল্‌সানো মাঠ থেকে সাদা পাড়ের মত ঝাপসা হাওয়া উঠছে—রোদে পোড়া অসংখ্য ঝোপঝাড়ের যন্ত্রণার দীর্ঘশ্বাস। রাস্তার ধারের নুয়ে-পড়া গাছের ডালের খড়খড়ে পাতাগুলো গনগনে হাওয়ার ছোঁয়া লেগে কাৎরিয়ে উঠছে।

লোকে বলে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তেমনি দিনের পরেই সন্ধ্যা। কিন্তু এই প্রচণ্ড গরমে ব্যারাক পর্যন্ত হেঁটে যেতে খুবই কষ্ট। এখন ডিউটি শেষ না হলেই ভাল হত। আর কেউ যদি তার খাবারটা এখানে এনে দেয় তাহলেই সে শুল্ক-ঘর থেকে একটা খাটিয়া চেয়ে নিয়ে রায় জগজীবন দাসের বাগানবাড়ির পাশের নিমগাছটার তলায় খাটিয়া পেতে আরামে একটা ঘুম দিতে পারে। বা বসে বসে কথা বলতে পারে ঘোসেড়া-বৌয়ের সঙ্গে—যার মাইদুটো ঠিক শালগমের মত উঁচু উঁচু। রহমৎ-উল্লারও চোখ আছে স্ত্রীলোকটির উপর। আর এই সময়টিতে রহমৎ-উল্লা এখানে থাকবেই, বিকেলের দিকে যখন কেউ কোথাও থাকে না এবং যখন সুযোগ নেওয়া সব চেয়ে সহজ সেই সময়টাই যেন রহমৎ-উল্লার বিশেষ করে পছন্দ।

'ব্যারাকে হেঁটে ফিরতে হবে।' বিড়বিড় করে কথাগুলো বলে হাই

তুলল সে। হেঁটে ফিরবার কথা মনে পড়তেই ক্লান্ত ও ভার মনে হচ্ছে শরীরটাকে তিন মাইল অবিশ্রান্ত পথচলার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়তেই নির্জীব হয়ে গেছে পা দুটো। মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে সে চেষ্টা করল জড়তার ভাবটা ঝেড়ে ফেলতে কিন্তু একটা সর্বগ্রাসী শক্তির অদৃশ্য উপস্থিতি যেন তাকে আচ্ছন্ন করেছে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বন্ধ হয়ে আসছে চোখের ভারী পাতাদুটো। জোরে একটা নিশ্বাস নিয়ে আর একবার সে চেষ্টা করল গাছের ছায়ার তন্দ্রালু ঘুম-ঘুম ভাবটাকে কাটিয়ে উঠে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকতে। কিন্তু কী বিরক্তিকর চোখ-ঝলসানো আলো, কী নির্দয় ও অর্থহীন বাইরের এই জীবন···কী শান্ত আর নিশ্চুপ গাছের তলা, চোখের পাতার আড়াল···

তার মনে হল, স্বয়ং ভগবানও যদি এখানে এসে দাঁড়াতেন তাহলে তিনিও চোখ না বুজে থাকতে পারতেন না। তারপর তার চোখে ঘুম এল। ঘুম এল নিঃশব্দসঞ্চারে, ঘুম এল দমকা হাওয়ার মত; নিঃশব্দ মাঠঘাটের উপরে গভীর আবেগে সূর্য জ্বলছে আর সেই জ্বলন্ত সূর্যের সহস্র চক্ষুর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে থেকে ব্রততী রূপসী লজ্জানম্র ভঙ্গিতে সরে আসছে যেন।···মস্তিষ্ক উত্তাপে গলে যাচ্ছে, চোখ যাচ্ছে অন্ধ হয়ে আর প্রশান্ত কমনীয়তায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে সে ছেড়ে দিয়েছে অর্ধ-ঘুমের আচ্ছন্নতার মধ্যে···

লাঠির মুণ্ডিটাকে মুঠো করে ধরা হাতের আঙুলের উপর মাথাটা আর একটু নুয়ে পড়ল, লালা গড়াল মুখের দু কোণ থেকে, ঘুমে ঢুলতে লাগল শরীর কিন্তু তবুও সে মোটামুটি খাড়া অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে রইল। ঘুমন্ত চোখেই তার মনে হল, চারদিকে যেন কি সব ফিসফাস আওয়াজ···

'শপ···শপ···শপ···' একটা সাপ যেন চোখেমুখে ছোবল মারছে।

তারি সুন্দর স্বপ্ন দেখছিল সে ; যেন এক প্রায়ান্ধকার শহরের অলিগলির আনাচকানাচ দিয়ে শিস দিতে দিতে একটা বাড়ির দিকে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন মুছে গেল···

'শপ···শপ···'

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যেতেই সে দেখল, থানাদার আবদুল করিম সামনে দাঁড়িয়ে, আফগানী ধরনের পাগড়ির নীচে অল্পবয়সী মুখখানা রাগে লাল, ঢ্যাঙা ছিপছিপে চেহারা ঋজু ও টান, হাতে বেত, পায়ে ঠেস দেওয়া সাইকেল···

'এই বেটা শিখের বাচ্চা, ওঠ! বারেটো বেজে গেছে তাই বুঝি আর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই?'

মংগল টলছে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। হাতদুটো আপনা থেকেই উঠে গেল পাগড়ির দিকে—ইন্‌স্‌পেক্টরের বেতের বাড়ি লেগে পাগড়িটা নড়ে গেছে।

'শপ্‌···শপ্‌···' আবার বেতের বাড়ি। একশো বিছের কামড়ের মত জ্বলছে গায়ের চামড়া। আর বেত চালানোর সঙ্গে সঙ্গে কুৎসিৎ গালাগালির তোড: 'বাঞ্চোৎ, তোর খেয়াল থাকে না যে এই পথ দিয়ে ডি-এস-পি যেতে পারে? তুই বেটা এখানে ডিউটিতে আছিস না হারামজাদা?'

নিজের অজান্তেই মংগলের ডান হাতটা পাগড়ি থেকে নেমে এসে স্যালুট দেবার ভঙ্গিতে কপালে ঠেকল। পুরু ঠোঁটদুটো কাঁপছে; ভাপ্‌সা গরম নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি অস্পষ্ট কথা বেরিয়ে এল ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে: 'হুজুর মা-বাপ!'

থানাদার চিৎকার করে উঠল: 'বেটা বেজন্মা, কোন্‌ বাপের ভাত

খাস্ ঠিক নেই, শূয়োরের বাচ্চা, জানিস তোর জন্যে আমি দাব্‌ড়ানি খাব, আমার প্রমোশন বন্ধ হয়ে যাবে ?'

থানাদার আবার বেত উঠিয়েছে! কিন্তু মংগল ভয়ে এমন কাঁপছে যে তার হাত থেকে লাঠিটা খসে পড়ল।

নীচু হয়ে মাটি থেকে লাঠিটা তুলে নিল সে।

'যা বেটা, যেখানে ডিউটি সেখানে গিয়ে দাঁড়া!' চড়া গলায় আদেশ দিয়ে প্যাডেলে পা রাখল থানাদার, তারপর কেৎরে কেৎরে সাইকেল চালিয়ে চলে গেল।

ছায়া থেকে বাইরে বেরিয়ে এল মংগল। হাঁটু ও উরু এখনো কাঁপছে, বুকের দপ্‌দপানি চেষ্টা করেও থামাতে পারছে না। অবশ্য তার ভয় যতটা না হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে ডিউটিতে অবহেলা করবার জন্যে বিবেকের দংশন।

ঘাড় দিয়ে দর দর করে ঘাম ঝরছে। ঘামে আর সূর্যের তাপে মুখের চামড়া তীব্র যন্ত্রণায় জ্বালা করতে লাগল। হাত দিয়ে ঘষতেই মনে হল যেন ঘামেভেজা চামড়া টাট্‌কা ক্ষতের মত চিন্‌চিন করছে।

সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিল সে। মাথাটা টন্ টন্ করছে। চারদিকে তাকিয়ে সে দেখে নিল কেউ তাকে মার খেতে দেখেছে কিনা। যন্ত্রণা সে সহ্য করবে মরদের মত। কিন্তু তার চোখদুটো ফুটন্ত জলে ভরে গেছে, আচমকা চোখ খুলতে গিয়ে আঁতকে ওঠার জন্যেই হয়ত। মাথা তুলতেই এই ফুটন্ত জল ধোঁয়া হয়ে চোখের সামনে পাক খেতে লাগল।

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কাশতে গিয়ে এমন কষ্ট হচ্ছে যে মোটা ও ঘন দাড়ি ঢাকা মুখের অনাবৃত অংশ লাল হয়ে উঠছে। থুথু

ফেলার জন্যে রাস্তায় একবার দাঁড়াতেই বুঝতে পারল যে পা দুটো কাঁপছে ঠক্ ঠক্ করে আগের চেয়েও জোরে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঁপুনি থামবার চেষ্টায় মুখটা বিকৃত হয়ে গেল, জোর করে সে এগিয়ে চলল সামনের দিকে...

'আরে গাধারা, মরবি, মরবি যে!' পিছন থেকে একটা গলা শোনা গেল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে সে দেখল, এক পাল গাধা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে আসছে। গাধার পালকে তাড়িয়ে যে লোকটা আসছে সেও পিছন থেকে দ্রুত ছুটে আসতে আসতে চেষ্টা করছে যেন ম্যাল রোডের এই জায়গায় গাধার পাল বড় রাস্তার উপড়ে গিয়ে না পড়ে। আর সে যত চেষ্টা করছে গাধার পাল তত বেশি দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ছুটছে।

গাড়ি চলে চলে বাদল রোডে পুরু ধুলো, সেই ধুলোর মেঘ উড়িয়ে গাধার পাল ছুটল। মুহূর্তের জন্য সেই লোকটি আড়াল হয়ে গেল মংগলের দৃষ্টি থেকে। কিন্তু হঠাৎ খুব কাছাকাছি জায়গা থেকে আবার চিংকার শোনা গেল : 'আরে গাধারা মরবি, মরবি যে!'

ধুলো-উড়িয়ে আসা গাধার পালের চালকের দিকে লাঠি উঁচিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বেগে ছুটে গেল মংগল। গাধার পাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল চারদিকে। কতকগুলি আরও জোরে ছুটে গিয়ে উঠল ম্যাল-এ, কতকগুলি ফিরে গেল, কতকগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একই জায়গায়। কলাবাগানের পাশের নালাটা পেরিয়ে পালাবার আগেই লোকটাকে ধরে ফেলল সে। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে একটা অর্ধো-চ্চারিত গালাগালি দিয়ে মারতে লাগল লাঠি দিয়ে। জোরে, জোরে,

আরও জোরে। লাঠির বাড়ি আড়াআড়িভাবে পড়ছে গাধার ঘাড়ে, লোকটার হাতে, গাধার পিঠে, গাধার মাথায়, লোকটার পায়ে···

'মাফ্ কিজিয়ে সরকার, আমার কোন কসুর নেই,' ক্রুদ্ধ বিরক্ত গলায় চিৎকার করছে লোকটা, গা ঘসছে আর হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে লাঠির বাড়ি ঠেকাচ্ছে।

'বেটা কুকুরের বাচ্চা,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করে মংগল আবার পিট্‌তে শুরু করল। জোরে, আরও জোরে, যেন সে পাগল হয়ে গেছে। শেষকালে মনে হল যেন লাঠিটা থেকে বাঁশচেরার মত আওয়াজ উঠছে।

নরসুন্দর সমিতি

[জন লেম্যান-কে]

আধুনিক ভারতের স্রষ্টাদের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের নাপিতের ছেলে চাঁদুরও একটা স্থান আছে। ইতিহাসে ওর অবদান যাতে স্বীকৃত হয় সেজন্যে আমি যদি বিশেষ ভাবে সচেষ্ট না হই তাহলে ও সেই স্থান থেকে বঞ্চিত হবে। স্বীকৃতি পাবার জন্যে চাঁদুর এই স্বকীয় দাবি এটা এমন একটা অসাধারণ কাজের জন্যে যার সম্পূর্ণ তাৎপর্য ওর নিজেরই জানা ছিল না। তবুও একথা সত্যি যে বর্তমান ভারতের অধিকাংশ বিখ্যাত লোকের মত ওরও নিজের গুরুত্ব সম্পর্কে কোন অতিরঞ্জিত ধারণা ছিল না যদিও তাদের মতই একটা নির্বোধ অহমিকা ওর ছিল। সেটা মাঝে মাঝে মনে হত অসঙ্গত, আবার মাঝে মাঝে বরং যেন ভালোও লাগত।

যে-সময়ে চাঁদু পেট-উঁচু আদুড় গায়ে কোমর থেকে এক ফালি ন্যাকড়া জড়িয়ে ঘুরে বেড়াত, তখন থেকে আমি ওকে চিনি। গাঁয়ের অলিতে-গলিতে কাদার মধ্যে দুজনে একসঙ্গে লুটোপুটি খেয়েছি, একসঙ্গে খেলেছি। কত রকমের খেলা, লড়াই-লড়াই, দোকান-দোকান, পুরুতগিরি এবং আরও সব কত ছোটখাটো খেলা। নিজেরা দুজনে

আনন্দ পাবার জন্তে ও মা-দের আনন্দ দেবার জন্তে খেলাগুলো আমরা মাথা থেকে বার করতাম। গুরুজনদের মধ্যে একমাত্র মা-রাই তবু যা হোক আমাদের দিকে নজর রাখেন।

চাঁদু আমার চেয়ে প্রায় ছ-মাসের বড়। সব সময়ে সব ব্যাপারে ও সর্দারী করত আর আমি স্বেচ্ছায় তার সর্দারী মেনে নিতাম। কারণ, বোল্তা ধরা, বোলতা ধরে টিপ দিয়ে বোল্তার লেজের দিক দিয়ে বিষ বার করে দেওয়া, বোল্তার পায়ে সুতো বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া—এসব ব্যাপারে ও ছিল সত্যিই প্রতিভাধর। আর আমি গাঁয়ের কুয়োর পাড়ে জল খাবার জায়গাটায় যেখানে বোল্তার চাক, তার কাছাকাছি যদি বা গিয়েছি অমনি বোল্তাগুলো আমার গালে হুল ফুটিয়ে দিত।

বড় হয়েও মনে হয়েছে ও যেন সব দিক থেকে নিখুঁত হওয়ার একটা জীবন্ত নিদর্শন। কারণ, যে-সব কাগজের ঘুড়ি ও তৈরি করে ওড়াত সেগুলো এমন জটিল পরিসজ্জায় ও এমন সুন্দরভাবে টাল্ না খেয়ে উড়ত যে তেমন ঘুড়ি আমি কিছুতেই বানাতে পারতাম না।

অবশ্য একথা ঠিক যে স্কুলে ও আমার মত অাঁক কষতে পারত না। তার কারণ বোধ হয় এই যে, ওর বাবা ওকে ছোটবেলা থেকেই জাত-ব্যবসা নাপিতগিরির কাজে হাতেখড়ি দিয়েছিলেন এবং চুল কাটবার জন্তে ওকে গাঁয়ে পাঠাতেন। স্কুলের মাষ্টারমশাই আমাদের যে-সব বাড়ির পড়া দিতেন তা তৈরি করবার মত সময় ওর ছিল না। কিন্তু সব সময়ই ও আমার চেয়ে ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারত। ও যে শুধু পড়ার বইয়ের কবিতা-গুলো তোতাপাখির মত মুখস্ত বলে যেতে পারত তা নয়, বইয়ের পাতার পর পাতা গন্ত

লেখাগুলোও এমন গড়গড় করে বলে যেত যে কবিতার মত মনে হত।

চাঁদু স্কুলে বৃত্তি পেত আর আমাকে পড়তে হত মাইনে দিয়ে এ-ব্যাপারটা আমার মা-র কিছুতেই বরদাস্ত হত না। সব সময়ে তিনি আমাকে এই বলে ওর সঙ্গে খেলা করতে বারণ করতেন যে চাঁদু ছোট-জাত নাপিতের ছেলে আর আমার উচিত জাত ও বংশের মর্যাদা রেখে চলা। কিন্তু আমি বংশপরম্পরায় পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আর যে-সব মজ্জাগত সংস্কারই পেয়ে থাকি না কেন, তাদের 'হাম-বড়া' ভাব যে পাইনি একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, রোজ সকালে যখন মা আমার কপালে শ্রেষ্ঠ বর্ণের চিহ্ন হিসেবে রক্ততিলক এঁকে দিতেন এবং সাজসজ্জা হিসেবে আমাকে পরিয়ে দিতেন সাবেকি ধরনের আচ্‌কান, চাপা পায়জামা, জরির কাজ করা জুতো আর রেশমি পাগড়ি তখন আমার বরং যেন লজ্জাই করত আর ইচ্ছে করত চাঁদু যে-ধরনের বিচিত্র ও চোখ-ধাঁধানো পোষাক পরে সেগুলো আমি পরতে পাই। চাঁদুর পোষাক ছিল অবসরপ্রাপ্ত সুবেদারের দেওয়া এক জোড়া খাকি হাফপ্যাণ্ট, আগাগোড়া ঝিনুকের বোতাম দিয়ে বাহার করা রং-চটা কালো ভেল্‌ভেটের ওয়েষ্টকোট আর একটা ফেল্টের গোল টুপি; এই টুপিটা এক সময়ে ছিল আমাদের গাঁয়ের উকিল লালা হুকুম চাঁদের।

চাঁদুর বাবা প্লেগে মারা যাবার পর থেকে ওর চলাফেরায় আর কোন বাঁধানিষেধ রইল না, আর তাই দেখে আমার হিংসে হত। কারণ, তখন থেকেই ও করত কি সকালে উঠে প্রথমে একটা চক্কর দিয়ে বড়জাতের বাবুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চুলকাটা-দাড়িকামানোর কাজ

শেষ করে আসত তারপর স্নান ও সাজসজ্জা সেরে চলে যেত শহরে—লালা হুকুমচাঁদ যে চারদিক-বন্ধ গাড়িতে শহরে যেতেন তারই পাদানীতে লুকিয়ে বসে।

তবে আমার উপর সদয় ছিল চাঁদু। ও জানত আমাকে কেউ কালেভদ্রে শহরে নিয়ে যায়। তাছাড়া, আমাকে প্রতিদিন দীর্ঘ তিন মাইল পথ ভেঙ্গে ভগবানের নাম জপতে জপতে যেতে হয় তিন মাইল দূরের বড় গাঁ জোয়াদিয়ালার মাধ্যমিক স্কুলে; ও কিন্তু দয়ামায়াহীন মাষ্টারের হাতে বেত খাওয়ার অগ্নিপরীক্ষা থেকে চিরদিনের মত রেহাই পেয়ে গেছে—বাবা মারা যাবার পরেই ও স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল। এইসব কথা ভেবে ও রোজই শহর থেকে আমার জন্মে কিছু না কিছু উপহার আনত—যেমন আঁকবার তুলি, সোনালী কালি, সাদা চক বা পেনসিল কাটবার দু-ফলা ছুরি। আর শহরে বাজারে যে-সব বিচিত্র জিনিস সে দেখে আসত তার চমৎকার সব বর্ণনা দিয়ে আমার কাছে গল্প জমিয়ে তুলত।

বিশেষ করে ও খুঁটিয়ে বর্ণনা দিত জেলা-আদালতে সাহেব-উকিল-চাপরাশি-পুলিসের চমৎকার সব বিলিতী ছাঁটের পোষাকের। লালা হুকুমচাঁদের ফীটনের পিছনে চেপে বাড়ির পথটুকু পাড়ি দেবার জন্মে রোজই ওকে জেলা-আদালতে অপেক্ষা করতে হ'ত, সেখানে এসব ওর চোখে পড়েছে। দু-একবার মনের একটা গোপন ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে আমার কাছে: ব্যবসাগত দক্ষতার জন্মে ওর যে উদ্বৃত্ত আয় হয় তা ওর মা একটা ঘড়ায় রেখে দেন, সেখান থেকে কিছু চুরি করে নিয়ে ও দাঁতের হেকিম কালান খাঁর মত পোষাক কিনবে। শহরে নাকি কালান খাঁর আশ্চর্য সব কাণ্ডকারখানা—পাটিকে পাটি দাঁত বসিয়ে দেন

মানুষের মুখে, নতুন চোখ পর্যন্ত লাগান। কালান খাঁর চেহারার একটা বর্ণনা ও দিয়েছে আমার কাছে। ছোকরা চেহারা, একপাশে পাট করা চুল, কড়া ইস্ত্রি করা সার্ট, হাতীর দাঁতের মত চকচকে কলার, 'বো' দেওয়া টাই, কালো কোট, ডোরাকাটা প্যান্ট, ভারি চমৎকার রবারের ওভারকোট, পাম্পসু। তারপর ও আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েছে কি রকম দক্ষতার সঙ্গে এই অদ্ভুতকর্মা লোকটি বিলিতী চামড়ার হাতব্যাগ খুলে ইস্পাতের ঝকঝকে যন্ত্রপাতিগুলো ফসফস করে টেনে বার করেন।

তারপর ও আমার মতামত জিজ্ঞেস করত। প্রাইমারী স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া নাপিত ও, ও যদি ডাঃ কালান খাঁর মত সাজপোষাক পরে তবে ওকে আরও বেশি উঁচুদরের লোক মনে হবে কিনা। ও বলত,

'অবশ্য মস্ত বড় পাশ করা হেকিম নই, তাহলেও ব্রণ, ফোঁড়া বা শরীরের কাটাকুটি কি করে সারাতে হয় তা আমি বাবার কাছ থেকে শিখে নিয়েছি। আমার বাবা আবার শিখেছেন তার বাবার কাছ থেকে।'

ওর এই পরিকল্পনায় আমি সায় দিতাম। আমার এই আদর্শ পুরুষের সমস্ত চিন্তায় ও কাজে আমার প্রবল আগ্রহ, সেই আগ্রহ নিয়েই উৎসাহিত করতাম ওকে।

একদিন সকালে আমাদের বাড়ির দরজায় চাঁদুকে দেখে আমি একেবারে রোমাঞ্চিত হলাম। মাথায় সাদা পাগড়ি, গায়ে সাদা রবারের কোট [গায়ে একটু বড় হলেও ভারি চমৎকার দেখতে , পায়ে পাম্পসু। জুতোর চামড়ায় সিলুয়েট ছবির মত আমার মুখের ছায়া দেখা যাচ্ছিল। হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। রোজকার মত চক্করে বেরোচ্ছিল ও, তার

আগে আমাকে দেখাতে এসেছে এই নতুন সাজপোষাকে ওকে কেমন চমৎকার মানিয়েছে।

আমি বললাম, 'বাঃ চমৎকার।'

তারপর ও জমিদার বাড়ির দিকে হন্‌হন করে হাঁটতে শুরু করল; রোজ সকালে ও জমিদারের দাড়ি কামায়। মুগ্ধ হয়ে আমিও পিছন পিছন চললাম।

এই সময়ে রাস্তায় বেশি লোক থাকে না; চাঁদুর এই ডাক্তারী সাজের জাঁকজমক প্রত্যক্ষ করবার মত একমাত্র আমিই ছিলাম। অবশ্য আমি ছাড়া চাঁদু নিজেও এ-বিষয়ে বরং যেন সচেতনই ছিল। দেয়ালে গাঁয়ের মেয়েদের দেওয়া ঘুটের দাগ আর নালার নোংরা জল থেকে নিজেকে সাবধানে বাঁচিয়ে সগর্বে পথ চলছিল ও। জমিদার বাড়িতে ঢুকতেই জমিদারের ছোট ছেলে দেবীর সঙ্গে দেখা। সে আনন্দে হাততালি দিয়ে চিৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিল যে চাঁদু নাপিত মিশন স্কুলের পাদ্রী সাহেবের মত জমকালো সাজপোষাক পরে এসেছে।

বেশ নাদুসনুদুস চেহারা জমিদার বিজয়চাঁদের, সবেমাত্র পায়খানা থেকে বেরিয়েছিলেন সুতরাং কানে পৈতে জড়ানো, সেই পৈতে ছুঁয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'রাম! রাম! রাম! শূয়োরের বাচ্চা গরুর চামড়ার ব্যাগ নিয়ে আমার বাড়ির ভিতরে এসেছিস, ব্যাটার গায়ের জামাটা কোন জানোয়ারের চর্বি দিয়ে তৈরি কে জানে, আর পায়ে ঐ অপবিত্র সাহেবী জুতো। বেরো এখুনি! বেরো বলছি! বেটা শয়তানের হাঁড়ি! আমার ধর্ম খোয়াতে চাস নাকি, বাপ মরে গিয়ে ভয়ডর আর নেই কাউকে, না?'

'কিন্তু জাগিরদার সাহেব, আমি যা পরেছি তা তো বস্তিরাও পরে।' চাঁদু বলল।

'দূর হ' হারামজাদা, তুই যেমন নীচু জাতের নাপিত তেমনি জামাকাপড় পরবি। ফের যদি তোর এসব বেয়াড়া বদখেয়াল দেখি তো চাবকাব ধরে।'

'কিন্তু রায় বিজয়চাঁদ সাহেব!' চাঁদু অনুনয় করল।

জমিদারবাবু চিৎকার করতে লাগলেন, 'দূর হ'! বেরো! বেটা অপদার্থ! যেখানে আছিস থাক্, সামনে এগুস্ না, তাহলে আবার সারা বাড়িটা গোবর দিয়ে শুদ্ধ করতে হবে।'

চাঁদু ফিরে এল; সারা মুখ টক্‌টকে লাল, ভারি দমে গেছে। আমার কাছে ও যে একজন কেউকেটা তা ও জানত, সুতরাং আমার সামনেই এই অপমানের লজ্জায় ও আর আমার দিকে ফিরে তাকাল না। হন্‌হন করে এগিয়ে গেল থানুরামের দোকানের দিকে। থানুরাম গাঁয়ের সাহুকর, গলির কোনে তার মুদীর দোকান।

জমিদারের ছেলে দেবী বাপের দাব্‌ড়ানি দেখে কাঁদতে শুরু করেছিল। তাকে শান্ত করবার জন্যে আমি একটু দাঁড়ালাম। তারপর বাইরে এসে গলির মোড়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল সাহুকর তার ধানচাল ওজন করবার দাড়িপাল্লাটা একহাতে উঁচিয়ে ধরে কুৎসিত ভাষায় চাঁদুকে গালিগালাজ করছে।

'বেটা নেংটি শুয়োর, কোথায় তুই সংসারের ভার নিবি, বুড়ী মাকে দেখা-শোনা করবি, তা না সং সাজবার শখ হয়েছে। হাসপাতালের লোকগুলোর নোংরা জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ানো! যা, ফিরে গিয়ে নিজের জামা-কাপড় পরে আয়। তবেই তোকে দিয়ে চুল

ছাঁটাব।' কথা বলতে বলতে সে মাথার উপরকার ধর্মের সাক্ষী গেরো দেওয়া চুলের গোছায় হাত দিল।

অত্যন্ত দমে গেল চাঁদু এবং দুরন্ত রাগে ছুটে বেরিয়ে গেল আমার পাশ দিয়ে—যেন আমিই এই সমস্ত দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। আমি বড় জাত বলে ও আমায় এবার ঘৃণা করছে একথা ভাবতেই প্রায় কান্না পেল আমার।

পিছন থেকে চিৎকার করে বললাম,

'পরমানন্দ পণ্ডিতের কাছে গিয়ে বল্ যে তুই যে পোষাক পরেছিস তাতে দোষের কিছু নেই।'

'ও তুমিও ওটার সঙ্গে তাল দিচ্ছ।' জমিদারবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে পণ্ডিত পরমানন্দ বললেন। দেখে মনে হল, এত বড় একটা অনাচার ঘটার ফলে যে জরুরি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সে-সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যেই পণ্ডিত পরমানন্দের ডাক পড়েছে।

'স্কুলে শিক্ষা পেয়ে ছেলেগুলো সব গোল্লায় গেছে। আচ্ছা, তুই না হয় লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হবি, তোর এসব পরলে কোন দোষ নেই। কিন্তু ঐ ছোট জাতের ছেলেটার এত সাজপোষাকের বাহার কেন? দাড়ি, মাথা, হাত, সমস্ত ছোঁয় আমাদের। ভগবানই তো ওকে যথেষ্ট অচ্ছুৎ করেছেন, আরও অচ্ছুৎ হবার প্রয়োজনটা কি ওর? তোর কথা আলাদা, তুই বড় জাতের ছেলে। কিন্তু ও ব্যাটা নীচু জাতের, ব্যাটা শয়তান, পাজির পা-ঝাড়া।'

কথাগুলো চাঁদু শুনেছিল। ও আর ফিরে তাকাল না, ঝড়ের মত ছুটে বেরিয়ে গেল। দেখে মনে হল যে গালাগাল শুনেই ও যে ছুটে

পালিয়ে যাচ্ছে তা যেন নয়, বরং ওর মাথায় কি যেন একটা মতলব এসেছে আর সেইজন্যেই ওর এত তাড়াহুড়ো।

আমার মা আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং নাওয়াখাওয়া সেরে স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি হতে বললেন। নইলে দেরি হয়ে যাবে। এই সুযোগে নাপিতের ছেলের সঙ্গে আমার মেলামেশা নিয়ে আর এক দফা বক্তৃতা দেবার লোভও সামলাতে পারলেন না তিনি।

তবুও চাঁদুর অদৃষ্টের কথা ভেবে ভয়ানক একটা অস্বস্তি অনুভব করলাম সারাদিন। এবং স্কুল থেকে ফিরবার পথে যে ধাওড়ায় চাঁদু আর ওর মা থাকে সেখানে হাজির হলাম।

খিটখিটে বুড়ী বলে ওর মা সবার কাছে সুপরিচিতা। নিজেদের আসল রূপ বড় জাতের মানুষরা দেখতে চায় না, কিন্তু এই ছোট জাতের বুড়ী চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিতেন আর তাই সবাই তাকে বলে খিটখিটে। আমার উপর তিনি সদয় ছিলেন যদিও আমার সঙ্গেও কথা বলতেন খোঁচা দিয়ে। পুরো ষাটটি বছরের অপমান ও নির্যাতনে তার কথা বলার ধরনটাই এই রকম হয়ে গিয়েছিল। আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন. বন্ধুর খোঁজে আসা হয়েছে বুঝি, তা বেশ। তোমার মা যদি টের পান যে তুমি এখানে এসেছ তাহলে তিনি তোমার চাঁদমুখের উপর কুনজর দিয়েছি বলে আমার চাখদুটো উপরে নেবেন। তুমি দেখতে তো বেশ গোবেচারা ভালো-মানুষ, তোমার মনটাও কি ঐ রকম? না কি তোমাদের দলের লোকদের মত তুমিও একটি ঘুঘু, মুখে এক আর মনে এক?'

'চাঁদু কি বাড়ি নেই মা?' আমি বললাম।

এবার তিনি আন্তরিক ও সরল সুরে বললেন,

'জানি না বাছা। বলল যে শহুরের দিকে গিয়ে রাস্তার ধারে লোকের দাড়ি কামিয়ে কিছু আয় করেছে। কি জানি বাপু কি ওর মতলব। বাপের আমলের মক্কেলদের এভাবে চটানো ওর ঠিক হচ্ছে না। ছোট ছেলে, মাথায় নানা রকম উদ্ভট খেয়াল চাপে। এতে কি ওদের রাগ করা উচিত। একেবারে শিশু ও। ওর সঙ্গে খেলতে যাবে বলে দেখা করতে এসেছ বুঝি? আচ্ছা, বলব এখন ও এলে। এক্ষুনি তো ও গেল, এই বড় রাস্তাটার দিকেই বোধ হয়।'

'আচ্ছা মা।' বলে বাড়ি ফিরলাম।

বিকেলে যথারীতি সাংকেতিক ভাষায় শিস দিয়ে চাঁচু আমাকে ডাকল। অভিভাবকেরা আমাদের মেলামেশায় রেগে গিয়ে বাধা দিতেন; তাদের বকুনির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এই সাংকেতিক শিসের ব্যবস্থা।

ও বলল, 'চল, বেড়াতে বেড়াতে বাজারের দিকে যাই, কথা আছে।'

তারপর ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসতেই ও বলতে শুরু করল, 'জানিস, আজ সকালে আদালতের কাছে চুল কেটে ও দাড়ি কামিয়ে এক টাকা আয় করেছি। হুকুমচাঁদের গাড়ীর পিছনের হাতলে চেপে বিকেল না হতেই তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হল, নইলে বেশি আয় হত। এই আমি বলে রাখছি, এই ধম্মপুত্তুর নিরেটগুলোকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। হরতাল করব আমি। কাজেকম্মে কিছুতেই আর ওদের বাড়ি যাব না। লালা হুকুমচাঁদের জুয়ারী ছেলেটার কাছ থেকে পাঁচ টাকায় একটা জাপানী সাইকেল কিনে সাইকেল চড়া শিখব আর তারপর সেই সাইকেলে চড়ে রোজ যাব শহরে। ওভার-কোট ও কালো চামড়ার জুতো পরে আর সাদা পাগড়ি মাথায় দিয়ে

যখন সাইকেলে চাপব· তখন চমৎকার দেখাবে না আমায়? আর কি জানিস, আমার যন্ত্রপাতির ব্যাগটা ঝুলিয়ে নেবার জন্যে দু-চাকা গাড়িটার সামনের দিকে আবার একটা হুকও আছে।'

রীতিমত উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি সায় দিলাম। চাঁছুর সাইকেলে চাপার গৌরব কল্পনা করে নয়, আমারই একটি উচ্চাশা প্রায় পূর্ণতা লাভ করতে চলেছে এই ভেবে। কারণ, মনে মনে আমি ভাবলাম যে চাঁদু যদি একটা সাইকেলের মালিক হয় তাহলে শেখবার জন্যে যখন-তখন ও আমাকে সাইকেলটা ছেড়ে দিতে না পারে কিন্তু পিছনের চাকার বেরিয়ে-আসা বল্টুটার উপর দাঁড় করিয়ে বা সামনের রডে বসিয়ে অন্তত শহরে কি আর নিয়ে যাবে না?

সাইকেল কেনার ব্যাপারে চাঁছু এমন একটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দরাদরি করল যে ওর ব্যবসাদারী দক্ষতা সম্পর্কে আমার নতুন করে জ্ঞান হল। ও যে-রকম বেপরোয়াভাবে টাকাপয়সা ওড়াত তা দেখে কোন দিন ঘুণাক্ষরেও আমার মনে হয়নি যে ওর এই ক্ষমতা আছে। তারপর চুপিচুপি ও আমাকে বলল, 'দু-একদিন সবুর কর্ না। দেখ না কী কাণ্ড তোকে দেখাই। এমন হাসতে হবে তোকে যে এর আগে কখনো আর তেমন হাসিসনি।'

'এখনই বলতে হবে তোকে।' অধৈর্য হয়ে ওকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। ওর মধ্যে যে দুঃসাহসিকতার ভাব ছিল তা একটা উত্তেজনার রেশ তুলে আমার চেতনাতেও সঞ্চারিত হয়েছিল, ফলে আমি আরও বেশি অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম।

ও বলল, 'না, সবুর করতে হবে তোকে। আমি এখন তোকে শুধু একটু ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে পারি। এ যে কী রহস্য তা একমাত্র

নাপিতরাই বুঝতে পারে। এবার আয় সাইকেল চড়াটা শিখে নেওয়া যাক। তুই সাইকেলটা শক্ত করে ধরে থাক আর আমি উপরে উঠি। সেই ঠিক হবে, না?'

আমি বললাম, 'কিন্তু এভাবে তো সাইকেল চড়া শেখে না। আমার বাবা সাইকেল চড়া শিখেছিলেন চাকার বেরিয়ে-আসা বল্‌টুটায় পা দিয়ে চেপে। আমার ভাই শিখেছিল প্রথমে প্যাডেলে পা দিয়ে ব্যালান্স করবার চেষ্টা করে।'

চাঁদু বলল, 'তোর বাবা একটি কুমড়োপটাস আর তোর ভাই তো ল্যাংপ্যাং সিং।'

'আচ্ছা বেশ', বলে আমি সাইকেলটা ধরলাম। কিন্তু সাইকেলের পালিশ করা চক্‌চকে রডগুলোর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তন্ময় হয়ে থাকতে থাকতে আমার হাতের মুঠো আল্‌গা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাঁদু সাইকেলসমেত উল্‌টো দিকে দড়াম করে পরে গেল।

সাহুকরের দোকানে জমিদারকে ঘিরে কয়েকজন চাষী জড়ো হয়েছিল, সেখান থেকে হো-হো শব্দে হাসির রোল উঠল। তারপর সাহুকরকে চিৎকার করে বলতে শোনা গেল: 'ঠিক হয়েছে। কলির কুপুত্তুর, হাড় গুড়ো গুড়ো হয়ে না মরলে তোর শিক্ষা হবে না বেটা ভুঁইফোঁড়দাস!

লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল চাঁদুর, বিড়বিড় করে আমাকে গালাগালি দিয়ে উঠল: 'হাঁদারাম, কোন কাজের নয়!' অবশ্য আমি ভেবেছিলাম ওর এই দুর্গতির জন্যে আমার ঘাড় চেপে ধরে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দেবে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'আচ্ছা দেখে নেব শেষ পর্যন্ত কার হাসি থাকে, আমার না ওদের।'

'এবার আমি সাইকেলটা খুব শক্তভাবে ধরে থাকব।' আন্তরিকতার সঙ্গে কথাগুলো বলে আমি সাইকেলটা মাটি থেকে তুলে নিলাম।

জমিদারের হুংকার শোনা গেল: 'শুয়োরের বাচ্চার হাড়গোড় ভাঙুক!'

চাঁদু আমাকে বলল, 'ওদের কথায় কান দিস না! ওদের আমি দেখাব।' তারপর আমি সমস্ত শক্তি দিয়ে সাইকেলটা ধরে রইলাম আর সাইকেলের উপর চেপে বসল ও। তারপর বলল ছেড়ে দে!'

আমি হাতের মুঠো ছেড়ে দিলাম।

ডান পা দিয়ে জোরে নীচের দিকে প্যাডেলের উপর ও চাপ দিয়েছিল। চাকাদুটো ঘুরতে শুরু করতেই ও বিপজ্জনক ভঙ্গিতে একপাশে কাত হয়ে পড়ল। কিন্তু ইতিমধ্যে ও অন্য প্যাডেলের উপর চাপ দিয়েছে। ডানদিকে একটু হেলে গিয়ে সাইকেলটার ভারসাম্য বজায় রইল। ফলে দেখতে পেলাম যে অত্যন্ত বিপজ্জনক ভঙ্গিতে চাঁদু সীট থেকে পাছাটা তুলে ধরেছে। প্রায় পড়ো-পড়ো অবস্থায় সে মুহূর্তের জন্যে ঝুলে রইল, হাতলটা সাংঘাতিকভাবে এঁকেবেঁকে যাচ্ছে, টলে পড়বার মত অবস্থা। ঠিক এই সংকট-মুহূর্তে দোকানের জটলা থেকে হাসি ও ঠাট্টার একটা মিলিত আওয়াজ ভেসে এল আর আমার মনে হল যে চাঁদুর নিজের চরম অক্ষমতার জন্যে না হোক গোলমালের জন্যেই ওকে বিপদে পড়তে হবে। কিন্তু ভারি আশ্চর্য বলতে হবে, কি করে যেন চাঁদুর পা-দুটো গতি-ছন্দের সঙ্গে মিলে গেছে, আড়ষ্ট হাতের মুঠোয় হাতলটা আর টলছে না। এবং ও সাইকেল চালিয়ে এগিয়ে চলল আর আমি প্রচণ্ড উৎসাহে উচ্ছ্বসিত

হয়ে 'সাবাস! সাবাস!' বলে পিছনে-পিছনে দৌড়তে লাগলাম। আধ মাইল গিয়ে আবার ও তেমনি কায়দায় ফিরে এল।

যদিও ওর এই নবার্জিত দক্ষতার আনন্দে অংশীদার হবার জন্যে আমি খুবই উৎসুক ছিলাম কিন্তু পরদিন আর চাঁচুর সঙ্গে আমার দেখা হল না। স্কুল থেকে আমাকে সোজা নিয়ে যাওয়া হল ভেরকা গাঁয়ে মাসীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

কিন্তু তৃতীয় দিনের দিন ও আমাকে ডেকে বলল যে সেদিন যে-মজার কথা ও বলেছিল তা আজ ও আমাকে দেখাবে। তাড়াতাড়ি ওর সঙ্গে বেড়িয়ে এসে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম,

'কি মজা, বল না একটু।'

গাঁয়ের কুমোরের চুল্লীর পিছনে লুকিয়ে ও বলল,

'তাকিয়ে স্থাখ, সাহুকরের দোকানে একটা জটলা দেখতে পাচ্ছিস? ভালো করে তাকিয়ে দেখ ওরা কারা।'

সমস্ত মুখগুলোই তন্ন তন্ন করে দেখে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম।

বললাম, 'ও তো চাষীরা বসে জমিদারের জন্যে অপেক্ষা করছে।

ও বলল, 'গাধা কোথাকার! আবার ভালো করে স্থাখ। ওই তো জমিদার বসে আছে। খেউরি না করে লম্বা চোয়ালওলা মুখটা সাদা দাড়ির জঙ্গলে কি-রকম বিশ্রী হয়ে আছে দেখেছিস?'

'হোঃ, হোঃ।' জমিদারের মোটা ঘন গোঁফজোড়ার পাশে [আমি জানতাম যে জমিদার তার গোঁফে কলপ দেয়] চোয়ালের উপর খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ির জঙ্গল এত বেশি বেমানান যে আমি রীতিমত মজা পেয়ে শব্দ করে হেসে উঠলাম।

'হোঃ, হোঃ ! ঠিক যেন একটা সিংহ ধুঁকছে। একেবারে কাহিল অবস্থা দেখছি।'

'চুপ, চুপ ! চাঁহু শাসিয়ে উঠল : 'চেঁচাসনি। একবার সাহুকরকে ছাখ। ওর হাওরধুখো গোঁফজোড়া এতদিন আমি ছেঁটে দিতাম, এখন গোঁফে তামাকের বাদামী ছোপ পড়ে ঠিক যেন ন্থাখাচ্ছে কুষ্ঠরোগীর মত। এবার তুই এক কাজ কর, 'গুঁফো ইঁদুর, গুঁফো ইঁদুর !' বলতে বলতে দোকানের পাশ দিয়ে ছুটে চলে যা। তোকে তো আর ওরা কিছু বলতে পারবে না।'

চাহুর এসব দুষ্টুমি বুদ্ধিতে আমি ছিলাম একান্ত অনুগত দোসর, ভালোমন্দ বিবেচনা করতাম না।

'গুঁফো ইঁদুর ! গুঁফো ইঁদুর ' গুঁফো ইঁদুর।' বলতে বলতে আমি দোকানের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে অশথতলার দাওযা পর্যন্ত ছুটে গেলাম।

দোকান ঘিরে যে-সব চাষী জটলা করছিল তারা হাসিতে ফেটে পড়ল। অনেকক্ষণ থেকেই তারা বোধ হয উসখুস্ করছিল, বয়স্কদের মুখভর্তি ঘন দাড়ি তারা আগেই লক্ষ্য করেছে কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে পারেনি।

'ধর, ধর, এই ক্ষুদে শযতানটাকে ধর তো। ওই নাপতে ছোঁড়া চাঁহুর সঙ্গে ওটারও যোগসাজস আছে !' সাহুকর চিৎকার করে বলল।

কিন্তু ততোক্ষণে আমি অশথ গাছটায উঠে পড়েছি, সেখান থেকে মন্দিরের দেওয়ালের উপর লাফিয়ে পড়ে পুরুতকে লক্ষ্য করে আবার সেই চিৎকার জুড়ে দিলাম।

চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়ল যে নাপিতের ছেলে ধর্মঘট করেছে।

বড়দের খেউরি-না-করা দাড়ি নিয়ে ঘরে ঘরে খুব ঠাট্টা-তামাসা চলল। এমন কি খুব বড় জাতের লোকেরাও আর গাঁয়ের কর্তাব্যক্তিদের পরিবার-পরিজনও বড়দের এই ভূতের মত চেহারা দেখে হেসে লুটোপাটি, কড়া কড়া মন্তব্যও চালাল। আর শোনা গেল, আর কেউ না হোক্ অন্তত জমিদারের বউ নাকি শাসিয়েছে যে সে কারও সঙ্গে পালিয়ে যাবে, কারণ এমনিতেই সে স্বামীর চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট, তবুও স্বামী যত দিন ফিটফাট থেকেছে সে সহ্য করেছে—এবার নাকি স্বামীর উপর তার এত বিতৃষ্ণা এসে গেছে যে আর মানিয়ে চলা যাবে না।

এদিকে এই কদিন শহরে চাঁদুর ব্যবসা বেশ ভালোই চলল। কিছু পয়সাও জমেছে হাতে—নিজের জন্যে নতুন নতুন জামাকাপড়, যন্ত্রপাতি আর আমার জন্যে নানা ধরনের উপহার কেনা সত্ত্বেও।

গাঁয়ের মাতব্বররা ভয় দেখাল যে ওর অপরাধের জন্যে ওকে জেলে পাঠাবে। চাঁদুর মার উপর হুকুম জারি হল যে শান্তিভঙ্গের অপরাধে চাঁদুকে পুলিসের হাতে ধরিয়ে দেবার আগেই যেন ওর মা ওকে জোর করে বড়দের কথা শুনতে বাধ্য করান।

কিন্তু চাঁদুর মা জীবনে এই প্রথম সুখের মুখ দেখছেন। তাদের সম্পর্কে তাঁর যা ধারণা সবই তিনি বললেন, এতকাল যে-ভাষায় কথা বলে এসেছেন তার চেয়েও স্পষ্ট ও সোজা ভাষায়।

তখন তারা ঠিক করল যে ভেরকা গাঁয়ের নাপিতকে এনে কাজকর্ম চালাবে। চাঁদুকে তারা সাধারণত দু-পয়সা করে দিত, ভেরকা গাঁয়ের নাপিতকে এক আনা করে দেওয়া হবে ঠিক হল।

কিন্তু ইতিমধ্যে চাঁদুর মাথায় একটা নতুন মতলব এসেছে। এত নতুন যে এতকাল যা কিছু সে ভেবে এসেছে কোন কিছুর সঙ্গে তার তুলনাই হয়

না। শহরেরর নাপিত নৃগেন দাসের দোকানটা দেখে তারও মাথায় বুদ্ধি খেলেছে বাজারের মাথায় বড় রাস্তার ধারে ঠিক এই ধরনের একটি দোকান খোলার। ওর খুড়তুতো ভাই ভেরুকা গাঁয়ের নাপিত, ধুন্নু, আর গাঁয়ের সাত মাইলের মধ্যে যেখানে যত গাঁয়ের যত নাপিত আছে সবাই হবে এই দোকানের অংশীদার। তার খুড়তুতো ভাই, ধুন্নু, আর সমস্ত নাপিতদের নিয়ে একটা বিশেষ সভা ডেকে ওর নতুন মতলবের কথা সবাইকে বলল। হৃদয় ও মস্তিষ্কের নানা গুণ ছাড়াও ওর ছিল কথা বলার ক্ষমতা, সবাইকে ও বুঝিয়ে দিল যে এবার সময় এসেছে যখন দাড়ি কামাবার জন্যে গাঁয়ের মাতব্বরদের ওদের কাছে আসতে হবে, ওরা আর প্রভুদের বাড়ি বাড়ি হুজুর-হুজুর করে ছুটোছুটি করবে না!

'রাজকোট জেলা নরসুন্দর ব্রাদার্স—চুল কাটা ও দাড়ি কামানোর দোকান'-এর দেখাদেখি আমাদের অঞ্চলে অনেকগুলো সক্রিয় মজদুর-ইউনিয়ন গড়ে উঠেছে।

ইনটারভিউ

[ডক্টর ও মিসেস হুসেন জাহির-কে]

সেদিন ফরিদপুর জেলের 'ভিজিটস' ডে'—বন্দীদের সঙ্গে তাদের আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের দেখা করার দিন।

কিন্তু হেড্ জেলার খাঁ বাহাদুর শেখ আহ্‌মেদ দীনের দক্ষিণা দিয়ে খুব কম লোকেই সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারত। এই সেদিনও তাই দর্শনেচ্ছু তিনজন লোক সেই লোহার খিল লাগানো বিরাট ফটক্‌টার সামনে অপেক্ষা করছিল।

তাদের একজন ছিল এক বুড়ো গরীব কৃষক। কাঁধের বাঁকে ঝোলানো এক রাশ জিনিসপত্তর নিয়ে সে বসে রয়েছে। অপেক্ষা রত দ্বিতীয় জন হচ্ছেন একজন তরুণী। সাদা সিল্কের সাড়ীর আঁচলখানা আলগাভাবে চুলের উপর এসে পড়েছে··প্রশান্ত গম্ভীর মুখখানার অনেকটাই চোখে পড়ে। এবয়সে এতোটা সচেতনতা সচরাচর দেখা যায় না, কারণ, ওর বাদামী রংয়ের ডাগর ডাগর চোখের তির্য্যক চাউনির আভাস এখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি। মনে হয়, ইতিমধ্যেই দুনিয়াটার অনেক কিছুই সে প্রত্যক্ষ করেছে। তিন জনের তৃতীয় ব্যক্তি ছিলাম আমি নিজে।

আজও আমার মনে পড়ে এই ঝঞ্ঝাহত লোলচর্ম বৃদ্ধ কৃষাণের পাশে ঐ শহুরে গুরুগম্ভীর তরুণীকে দেখে আমি সেদিন সত্যিই অবাক হয়ে

গিয়েছিলাম···কেমন একটা তুলনামূলক চিত্রও আমার মনের পটে ভেসে উঠেছিল। ভেবেছিলাম, এই মেয়েরা সাড়ী-বদলানোর মতো কেমন সহজে মনও বদলাতে পারে···এরাই আবার সাড়ী-পড়ানো পুতুলের মতো ঘরের মধ্যে বসে পান চিবোতে চিবোতে দাসদাসীকে বকুনী আর হুকুম জারী করে।

আদালতের পাশ দিয়ে আসার সময়েই চোখে পড়েছিল ন্যুব্জদেহ বুড়ো বুড়ো চাষীদের ঘিরে ঝানু উকীলদের ভিড়। সুতরাং জেলখানার গেটে বৃদ্ধের আগমনের মোটামুটি একটা কারণ আঁচ ক'রে নিলাম। জেলখানা—আমাদের দেশে গরীবদের এর লাল ইটের গহ্বরের অভ্যন্তরে পুরবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে হাঁ করে। বুঝলাম, বৃদ্ধের কোনও আত্মীয়স্বজন এসেছে এখানে। কিন্তু এই তন্বী তরুণীর এখানে আগমনের কারণ খুঁজে পেলাম না। আমি দেখা করতে এসেছি রাজবন্দী অজিত কুমার সেনের সঙ্গে···দেউলীর বন্দী শিবির থেকে বদলী করে এদের আনা হয়েছে ফরিদপুর জেলে। গত দু'বছর ধরে এদের উপরে নির্বিচারে কত অত্যাচারই না হয়েছে। তা হোলেও, জেলখানা সম্বন্ধে তখনও আমার ধারণা যে এটা যতো অপরাধী, চোর খুনেদের রাখার জায়গা; সুতরাং ঐ সিল্কের সাড়ী-পরা তরুণীর ওদেরই কারুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রয়েছে—একথা কোন মতে মনে মনে আমি মেনে নিতে পারছিলাম না।

মহামান্য ভারত সরকারের পদস্থ কর্মচারীদের একটা অতি সামান্য কাজ করতেও যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগে এ অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই আছে। তাই অপেক্ষায় অনেকক্ষণ জেল গেটে দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী মনে মেয়েটির উপস্থিতি বার বার অনুভব করছিলাম। কৌতূহলী হবার আরও কারণ হল যখন দেখলাম

লম্বা গোঁফওয়ালা সশস্ত্র সান্ত্রীটা আড়চোখে ওর দিকে নজর দিচ্ছে। লম্বা বন্দুকটা কাঁধে ফেলে সান্ত্রী এধারে ওধারে এক একবার পদচারণা করছে, কখনও ভারী বুট ঠুকে শব্দ করছে, কখনও বা বন্দুকের কুঁদোটা সজোরে মাটিতে ঠুকে, আবার কখনও গলা ঝেড়ে কেশে নানাভাবে সে চাইছে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে।

শেষে, চুপি চুপি বলেও ফেললে, 'মাইরী, তাকাওনা বাপু একবার'— অনেকটা অনভ্যস্ত গেঁয়ো হৃদয়-বিলাসীর ভীরুচোরা ভাষায়; যেন এই নারী-সন্ধিৎসু অভিসারের প্রচেষ্টা হাটে হাঁড়িভাঙার অবস্থায় যেতে দিতে সে রাজী নয়, কারণ ততোধিক সম্ভ্রমতা সে তখনও নিজের রাখে।

মেয়েটি কাপড় চোপড় সামলে নেয়, আঁচলটা টেনে দেয়, নড়ে চড়ে বসে, সাড়ীর আঁচল দিয়ে হাওয়া খেতে থাকে।

সান্ত্রী তার কাছ থেকে কযেক পা দূরে সরে যায়—ভাবটা এই যে একটা জঘন্য নরকের দ্বারপাল হিসেবে তার যে কর্তব্য তাতেই সে এবার মন দেবে। সে-নরকটায় গ্রীষ্মের সূর্য মধ্যাহ্নের সমস্ত উত্তাপই অবিরাম ঢেলে দিচ্ছে। কিন্তু আবার সে পিছিয়ে এলো; সুগন্ধভরা হাওয়ার সুদীর্ঘ শ্বাস টেনে, সে গোঁফ জোড়ায় সদন্তে তা' দিলো এমন ভাবে যেন তার অহমিকাপূর্ণ বিরক্তির ভাবটা মুখে ফুটে ওঠে।

পেছনের সড়ক দিয়ে আদালত থেকে কযেকজন নতুন কয়েদীকে নিয়ে আসছিল · মার্চ করে আসার সময়ে পরস্পর ঠোকাঠুকি লেগে তাদের হাতকড়া ও শেকলগুলোর শব্দ কানে এসে বাজে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার! তখনও পর্যন্ত কোনো 'সেনেরই' আসাব কোনো চিহ্ন দেখা গেল না সে-ঘরে। অগত্যা, সান্ত্রীর দিকেই নজর দিলাম আবার।

সেই বড়ো কৃষক আর আমি মেয়েটির কাছে তার প্রেম নিবেদনের ব্যর্থ

চেষ্টা দেখে ফেলেছি ভেবে, সে বোধহয় ঠিক মেজাজে ফিরতে পারছিল না,. শেষ পর্যন্ত তাই 'গান গেয়ে মনের ইচ্ছা পূরণ করবার সিদ্ধান্তই বোধহয় সে নিল ; শ্রীমতী দুলারীর সম্প্রতি গাওয়া একটা গানের সুর ভাজতে লাগল সে। তবে বুঝলাম তার নিজের সুর সম্বন্ধে নিজেরই খুব আস্থা ছিল না। কাজেই গলার পর্দা সম্বন্ধে সে বিশেষ সচেতনই ছিল।

কিন্তু মেয়েটির কাছে তার প্রস্তাবনার ব্যর্থতা ওকে আবার পেয়ে বসলো। ' নিজের মনেই এবার সে বকতে শুরু করলো।

'নিজের প্রশংসায় কেউ ছাই কানই দেয় না'—গুটি-মুখো হেড ওয়ার্ডারের উদ্দেশ্যে সে কথাগুলো বলল। হেড ওয়ার্ডার বসেছিল বিরাট লোহার ফটকের ছোট্ট প্রবেশ পথের পাশে…টেবিলের ওপরের রেজেষ্ট্রী খাতার উপর ঝুঁকে ব্যস্ত হয়ে ডানহাতে যেন সে কি লিখছে, বাঁ হাতে চাবীর একটা মস্তো কড়া।

বেশ একটু শুনিয়ে শুনিয়ে গুটি-মুখো হেড ওয়ার্ডার বললে : 'বলি ব্যাপার কি! জেলখানা যেন আজ নেশা পেয়ে গেছে। ঈদের চাঁদ কি আজ এরি মধ্যে দিক ছাড়িয়েছে নাকি'…কথাগুলো স্পষ্টতঃ মেয়েটিকে উপলক্ষ্য করে হোলেও ভাব দেখালো যেন এই কথাগুলো ঐ নবাগত কয়েদীদের উদ্দেশ্যেই।

'জেলখানায় রাজা হওয়নের চাইয়্যা পাখী হওন অনেক ভাল'… তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব কাটিয়ে আমার দিকে একটু তাকিয়ে বিড় বিড় করে আপন মনে বলে বুড়ো।

সগু-আগত কয়েদীদের শৃঙ্খলের ঝন ঝন শব্দে ও হেড-ওয়ার্ডারের হালকা রসিকতায় সাস্ত্রীর মনে হোলো যেন, তার কীর্তিকলাপ সব বেফাঁস না হয়ে যায়।

বেশ গলা বাড়িয়েই বললে সে: 'ঈদের চাঁদ গো, একটু কথাই বলো না, আমার যে তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে গেল।'

মেয়েটি এবার আমার দিকে ফিরে বসে।

'আচ্ছা, আমাদের শিগগির দেখা করবার অনুমতি কি দেবে এরা?'

ওর কথার উত্তর দেবার আগেই কিন্তু শাস্ত্রী একটা গানের সুর ভাঁজতে আরম্ভ করে।

'সময় তো লিখে দিয়েছিল ঠিক দু'টোয়', আমি বললাম।

নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তরুণী বললে: 'কিন্তু এখন তো পৌনে চারটে'।

'খাঁ বাহাদুর হয়তো এখন দিবানিদ্রায় মগ্ন', বললাম আমি।

'আর এই তো এগোর কাজ—হা' কপাল! কে জানে কোন উকীল দাঁড়াইছে অর লাইগ্যা...' দুহাতের মাঝে ঘাড় গুঁজে বসেছিল বৃদ্ধ কৃষাণ ..কপালে জমে-ওঠা ঘাম মুছতে মুছতে বিড় বিড় করে সে বলল। এমন সময় সেই ছোট্ট দরজাটার কাছে এসে হেড ওয়ার্ডার চাবি দিয়ে ফটকের তালা খুলে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে ডেকে বললো নতুন কয়েদীদের ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে।

কর্মচারীটির পেছনে পেছনে অনেক কষ্টে কয়েদীরা যখন ছোট্ট হল-ঘরটার মধ্যে গিয়ে ঢুকলো, তাদের হাতকড়া এবং শৃঙ্খলের ঝঞ্ঝনার শব্দে আবহাওয়া আর্ত হয়ে উঠলো। কয়েদীরা ধীরে ধীরে গিয়ে হেড ওয়ার্ডারের ডেস্কের সামনে লাইন দিয়ে বসলো। বুড়ো চাষী আবার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। শাস্ত্রীর মনে হলো যে তার 'পিয়ারী' আমার উপস্থিতির ছায়ায় আশ্রয় খুঁজছে। সে আবার পদচারণায় মন দিলো।

'অজিত সেনের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতির জন্যে হোম্ মিনিষ্টারের কাছে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারীর একখানা চিঠি নিতেই সারা সকালটা কেটে গেছে। আর এখন আবার এখানে সারা তুপুরটাই দেখছি লেগে গেল।'

'আমিও তো তাঁর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি,' গভীর আবেগে বলল মেয়েটি। একটী গর্বিত মনোভাব ওর সারা মুখখানা ছেয়ে ফেলেছে। সাড়ীর আঁচলটা একটু টেনে দিল ও।

'আরে বাঃ বাঃ! কেয়া খুরৎ রে! সুন্দরীকো বাত ক্যা বাতানে', শাস্ত্রীর মন্তব্য দূর থেকে কানে এসে লাগে।

বুড়ো কৃষকের নাক সমানে ঘড়ঘড় শব্দ করে।

কয়েদীরা নড়েচড়ে বসে, আর শৃঙ্খল-ঝঙ্কারে সমস্ত স্থানটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

আমি শুধু দ্রুত নিঃশ্বাস নিয়ে একবার মেয়েটির দিকে চেয়ে আবার অন্য-মনস্ক হয়ে ভাবি, পুলিস ও জেল প্রহরীর জঘন্য ঠাট্টা তামসার সম্মুখীন হতে হয় জেনেও কেন মেয়েটি নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছে এখানে? চোখ ফিরিয়ে তাকাতেই দেখলাম কয়েদীরা শৃঙ্খলের চাপে আর হাত কড়ার ধারালো কোণে লেগে ছড়ে-যাওয়া কব্জীতে খড় আর ন্যাকড়া জড়িয়ে বেঁধে নিচ্ছে।

'শুনলাম ওদের আজকাল আবার বইপত্তরও পড়তে দেওয়া হয়,' বললে মেয়েটি: 'এমন কি পত্রিকাও। ওরা ওদের ব্যারাকে এমন সুন্দর করে একটা ফুলের বাগিচা করেছে যে দেখলে মনে হয় একটা হাতুড়ী কাস্তে আর তারা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'তারা দেখছি কর্তৃপক্ষকে পরোয়াই করে না?' আমি অবাক হয়ে বললাম, কারণ, ফরিদপুর জেলে ওরা আবার ফুলের বাগান করবার সুযোগ কি ক'রে পেলো?

'ওদের কয়েকজনকে বরফের চাঁইয়ের ওপরে শুইয়ে রেখেছিল… তাদের ওপর অত্যাচার এমন হয়েছে যে—'

'শুনেছি ক্যাম্পে নাকি কয়েকজন ছাত্রের নখের নীচে পিন ফুটিয়ে দেওয়া হোতো', বললাম ওকে। সে মাথা হেঁট করে রইলো। সে-সব অত্যাচারের কথা ভেবে ওর মুখখানা আরও করুণ হয়ে উঠলো!

ঠিক এই সময়ে হলের কোণে অবস্থিত তার অফিস থেকে গলা বাড়িয়ে মুন্সী দীননাথ হাঁকলেন: 'নতুন কয়েদীদের এক এক করে ঢুকিয়ে দাও এবার।' তার কোমর-বন্ধের দড়িগুলো বেশ একটু নড়েচড়ে উঠলো।

'ও দারোগা সাহেব!' উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম আমি।

'আরে, এঁরা দেখা করবার জন্যে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন দেখছি, কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!' এমন স্বরে বলেন দীননাথ যেন এ সম্বন্ধে কিছুই এত-ক্ষণ জানতেন না তিনি; নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেড ওয়ার্ডারকে ডেকে বললেন,'এরা এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন আমায় বলোনি কেন?'

'হুজুর, হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি তো রাজবন্দীকে ডেকে এনেছিলাম দেখা করবার জন্যে, এখনও ভিতরের ঐ উঠোনটায় তিনি অপেক্ষা করছেন।'

'এক্ষুনি হলের মধ্যে নিয়ে এসো…এক্ষুনি…যাও…মন্ত্রী মশাই ভীষণ রেগে যাবেন…পত্রিকার প্রতিনিধিকে এতক্ষণ ধরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি জানতে পারলে… উঃ…আর এই মহিলারও দেখা করার আদেশ-পত্র রয়েছে।'

হেড্ ওয়ার্ডার তাড়াতাড়ি ভেতরের কাঠের দরজার দিকে এগিয়ে যায় চাবির তাড়া নিয়ে, ছোট্ট খুপরীটা খুলে চিৎকার ক'রে ওয়ার্ডারকে ডাকে…'সুলতান, ওঁকে নিয়ে আয়।'

অজিতকুমার সেন এতক্ষণ ভেতরের দরজার পেছনে কর্তৃপক্ষের অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। হেড্ ওয়ার্ডার ভেতরের দরজা খুলে দিল বন্দীর প্রবেশের জন্য।

মেয়েটি এতক্ষণ নীচু হয়ে বসেছিল। এবারে উঠে ফটকের রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল। তার চোখ দুটো অজিতের শীর্ণ মুখের ওপর স্থিরভাবে নিবদ্ধ…জেলের অদ্ভুত জামা আর হাফ প্যান্ট পড়ে অজিতবাবু এসে দাঁড়ালেন হলের ভেতরে।

যে সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান মানুষটিকে এককালে আমি জানতাম আজ তার ন্যুব্জ দেহ বন্দীর পোষাকে দেখার প্রথম হকচকান ভাব কেটে যাবার পর আমি তাকে নমস্কার জানালাম।

ওয়ার্ডার আমাদের সামনের জেল ফটক খুলে দিল আমাদের প্রবেশের জন্য।

মেয়েটিকে আগে ঢুকতে দেবার জন্যে আমি একটু দাঁড়ালাম। একবার তাকিয়ে দেখলাম বৃদ্ধ চাষীর দিকে। বেচারা ফটকের পাশের শিশু-গাছের নীচে অত্যন্ত অসহায়ের মতো বসে আছে।

কিন্তু মেয়েটি তখনো দাঁড়িয়ে।

'আসুন, আসুন'—ডাকেন দীননাথ। গুটি-মুখো হেড্ ওয়ার্ডার একান্ত অনুগতভাবে আদেশের জন্যে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে।

অজিতকুমারের ফ্যাকাশে রুগ্ন মুখের থেকে দৃষ্টি নামিয়ে হেঁট হয়ে হাসের মতো পা দুখানাকে টেনে টেনে যেন সে ভেতরে নিয়ে গেলো!

দুপা কি তিন পা গিয়েই আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, হয়তো নিজেকে সংযত করে নেবার জন্যে। তারপরে হাতদুখানা তুলে সোজা টান করে নিয়ে মাথা সোজা করে তাকালো অজিতের দিকে। তার

মুখখানা যেন মনে হচ্ছে ব্রোঞ্জের তৈরী, স্ফীত নাসিকা কাঁপছে আবেগে, একটা অধৈর্যের শিখা যেন এসে লেগেছে গালে। মুহূর্তের জন্যে হলেও কেমন এক অদ্ভুত কাতরতা ফুটে উঠেছে তার সর্ব অবয়বে।

আমি মেয়েটির পেছনে এসে দাঁড়ালাম।

নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন অজিতবাবু। তার চোখ দুটো কোটরের মধ্যে আরও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, কেমন যেন একটু সজলভাব সে-চোখে। সমস্ত মুখখানাই যেন শুকিয়ে কুঁকড়ে গেছে ওঁর, ভাঁজ পড়েছে চামড়ায়, তবুও উন্নত-শির মানুষের আত্মসম্মান ও গর্বের মূর্ত প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন রাজবন্দী।

এ্যাসিষ্টাণ্ট জেলর সাহেব এবার চারদিকের লোকজনদের দিকে হাঁ হাঁ করে দৌড়ে গেলেন, চেঁচিয়ে হুকুম করলেন সবাইকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে।

ফটকের বাইরের ওয়ার্ডারের হঠাৎ যেন খেয়াল হলো। বুড়োর দিকে হেঁকে বলল, 'আরে, এই বুড়ো, তুই কার সঙ্গে দেখা করবি?' হিতাকাঙ্ক্ষীর স্বরের ছোঁয়া যেন লেগে আছে এই প্রশ্নে।

'শয়তানের আবার প্রায়শ্চিত্ত'···বুড়ো বিড়বিড় করে বলে।

এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট জেলারের শীতল কক্ষে দাঁড়িয়ে আমি অবাক হয়ে শুধু ভাবছিলাম যে অজিত আর মেয়েটির মধ্যে এমন কিসের বন্ধন রয়েছে, কীই বা হয় মেয়েটি অজিত সেনের?

কিন্তু ঠিক আমার চোখের সামনেই, বিস্ময়বিভোর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে স্তব্ধবাক তন্বী তরুণীটি অজিতকুমারের দিকে, স্থির অকম্পিত দৃষ্টি, অন্ধের চোখের মত···জীবনের মত, মৃত্যুর মত, অন্ধ ভালবাসার মত, পলকহীন···নিশ্চল নিথর···স্তব্ধ···